জারুল চৌধুরীর মানিকজোড়

১. আমার বাবা

বাসায় ঢোকার আগেই বুঝতে পারলাম আজকে আমার কপালে দুঃখ আছে। ছোটখাট দুঃখ নয়, বড়োসড়ো ডাবল সাইজের দুঃখ। বাইরে দড়িতে একটা লুঙ্গি ঝুলছে, তার মানে বাবা এসেছেন। শিউলী গাছের একটা ডাল আজকে আমার পিঠে ভাঙা হবে। বাসার এত কাছে শিউলী গাছ থাকার কোন অর্থই হয় না। সারা বছরে মাসখানেক তিন-চারটা ফুল দিয়েই তার কাজ শেষ, লাভের মাঝে লাভ বাবা যখন খুশি তখন পেটানোর জন্যে সেখান থেকে একটা ডাল ভেঙে আনতে পারেন।

আমি ভয়ে ভয়ে ভিতরে ঢুকলাম। মনে খুব একটা দুর্বল আশা, দড়িতে যে লুঙ্গিটা ঝুলছে সেটা বাবার না, অন্য কারো। গ্রামের বাড়ি থেকে কেউ বেড়াতে এসেছে, কারো বিয়ে কিংবা অসুখ, জমি নিয়ে মামলা করতে এসেছে বা সে রকম একটা কিছু। ভিতরে ঢুকতেই আমার আশা ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল। শুনতে পেলাম বাথরুমে বাবা ঘড়ঘড় শব্দ করে জিব পরিষ্কার করছেন। জিব পরিষ্কার করার এই ব্যাপারটা আমি বাবা ছাড়া আর কাউকে কখনো করতে দেখিনি। প্রথমে একটা চিকন বাঁশের চাঁছ দিয়ে জিবটা চেঁছে ফেলেন। তারপরে শোল মাছ ধরার মত নিজের জিবটা ধরার চেষ্টা করতে থাকেন, সেটা বারবার পিছলে যায়, তবু তিনি হাল ছাড়েন না। একবার ধরার পর সেটা নানাভাবে কচলাতে থাকেন, ঘষতে থাকেন, রগড়াতে থাকেন, তখন একই সাথে তার গলা থেকে এক রকম ঘড়ঘড় শব্দ বের হতে থাকে। শুনলে মনে হবে কেউ বুঝি তাঁকে জবাই করে ফেলার চেষ্টা করছে। পুরো ব্যাপারটাই একটা খুব খারাপ দৃশ্য, দেখার মত কিছু নয়। মাসে এক-দুইবার যখন বাবা আসেন তখন আমাদের প্রত্যেক বেলা সেই দৃশ্যটা দেখতে হয়, শুনতে হয়। বাবা ঢাকায় একটা ওষুধের কোম্পানিতে কাজ করেন। যত টাকা বেতন পান এবং ঘুষ খেয়ে চুরি-চামারী করে আরো যত পয়সা পান সব দিয়ে আমাদের সবাইকে নিয়ে খুব সহজেই ঢাকায় একটা বাসা ভাড়া করে থাকতে

পারতেন। কিন্তু বাবা সেটা করেন না। আমাদেরকে মফস্বলের এই ছোট শহরে মায়ের সাথে রেখে তিনি ঢাকায় জঘন্য একটা মেসে একা একা থাকেন। ছুটিছাটায় বাবা বাসায় আসেন, বাসায় এসে দুই বেলা জিব পরিষ্কার করেন আর আমাদের দুই ভাইকে পেটান। আগে ভাবতাম, নিশ্চয়ই সত্যি সত্যি আমরা কোন দোষ করি যার জন্যে এই শাস্তি। এখন বুঝতে পেরেছি, আমরা আসলে কিছু করিনি, বাবার পেটাতে ভাল লাগে, খুব একটা আনন্দ পান পিটিয়ে। ঠিক শুরু করার আগে আমি বাবাকে সুড়ুৎ করে মুখে লোল টেনে নিতে দেখেছি। কিছু কিছু মানুষ নিশ্চয়ই আছে যারা এরকম হয়, যাদের পেটাতে ভাল লাগে। আমার বাবা সেরকম একজন মানুষ। নিয়মিত পিটুনী খেলে মানুষের অভ্যাস হয়ে যাবার কথা, কিন্তু আমাদের এখনও অভ্যাস হয়নি। পিটুনিটা একটু বাড়াবাড়ি, ছোটখাট চড় চাপড় বা কানমলা নয়, প্রচণ্ড মার, কখনো কখনো চামড়া ফেটে রক্ত বের হয়ে যায়। আমি তবু কোন মতে সহ্য করতে পারি কিন্তু লাবলুর একেবারে বারটা বেজে যায়। কেমন করে পিটুনী খেলে ব্যথা কম লাগে আমি লাবলুকে অনেকবার তার ট্রেনিং দিয়েছি, কিন্তু গাধাটা এখনো কিছু শিখেনি।

বাবা বাথরুম থেকে বের হওয়ার আগেই আমি শুট করে রান্নাঘরে ঢুকে যাবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু বাবা তবু দেখে ফেললেন। আমাকে দেখেই দাঁত মুখ খিচিয়ে একটা গর্জন করে বললেন, শুওরের বাচ্চার এখন বাসায় আসার সময় হয়েছে? হারামজাদা, আজকে যদি আমি পিটিয়ে তোর পিটের চামড়া না তুলি —

বাবা আমাকে শুওরের বাচ্চা না হয় হারামজাদা ছাড়া আর কিছু ডাকেন না। আমার যে একটা নাম আছে, একসময়ে নিশ্চয়ই বাবাই সেটা দিয়েছিলেন, সেটা মনে হয় তাঁর মনেই নেই। বাবার চেহারা, কথা বলার ধরন, চালচলন সব কিছুতে একটা পশু পশু ভাব রয়েছে। কোন্ পশু সেটা ঠিক ধরতে পারি না, মাঝে মাঝে মনে হয় শেয়াল, মাঝে মাঝে মনে হয় বেজী না হয় নেউল। মুখটা একটু লম্বা, বড় বড় দাঁত, পান খেয়ে দাঁতে হলুদ রং, দাঁতগুলির মাঝে বড় বড় ফাঁক, থুতনিতে এক গোছা দাড়ি, পশু মনে হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

বাবা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত গুটালেন, মনে হল এখনই আমাকে এক রাউণ্ড পিটিয়ে নেবেন, কিন্তু কি মনে করে পিটালেন না। মনে হয় মাগরেবের নামাজের সময় হয়ে গেছে, এখন জুত করে পেটানোর সময় নেই। গামছা দিয়ে দাড়ি মুছতে মুছতে দাঁত কিড়মিড় করে আমাকে গালি দিয়ে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তে চলে গেলেন। একটু পরেই পাশের ঘর থেকে আমি বাবার একামৎ শুনতে পেলাম।

আমি রান্নাঘরে গিয়ে দরজার আড়ালে লাবলুকে খুঁজে পেলাম। ফোঁসফোঁস করে কাঁদছে। মা খুব হৈ চৈ করে ঘামতে ঘামতে রান্না করছেন। কড়াইয়ের মাঝে গরম তেলে কি একটা ছেড়ে দিলেন, ছ্যাৎ ছ্যাৎ শব্দ হতে লাগল। রান্নাঘরে তেল মশলার গন্ধ, চুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে। আমি তার মাঝে লাবলুকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা কখন এসেছে?

লাবলু ফোঁসফোঁস করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, দুপুরে।

কাঁদছিস কেন?

লাবলু কিছু বলল না। জিজ্ঞেস করলাম, মেরেছে তোকে?

না। এখনো মারে নাই।

তাহলে কাঁদছিস কেন?

এখুনি তো মারবে।

আমি কি বলব বুঝতে পারলাম না। লাবলুটার মত গাধা আর একটাও নেই। আজকালকার দুনিয়ায় এরকম বোকা মানুষ কেমন করে জন্ম নেয় কে জানে! আমি গলা নামিয়ে বললাম, শার্টের তলায় একটা হাফ সোয়েটার পরে নে। আর মনে রাখিস, যখন মারবে তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করবি। ভান করবি মরে যাচ্ছিস।

কেন?

তাহলে ব্যথা কম লাগে।

লাবলু অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমার বয়স বার, লাবলুর আট, আমার থেকে চার বছরের মত ছোট। কিন্তু তার বুদ্ধিশুদ্ধি মনে হয় একেবারে তিন বছরের বাচ্চার। আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, সত্যি?

হ্যাঁ। আমি মাথা নেড়ে বললাম, আর খুব জোরে যদি চিৎকার করিস তাহলে কেউ একজন এসে তো ছুটিয়েও নিতে পারে।

কে ছুটাবে?

আমি কিছু বললাম না। সত্যিই তো, কে ছুটাবে? মায়ের সেই সাহস নেই, ইচ্ছাও নেই। আশেপাশের বাসায় যারা আছে তারা শুধু মজা দেখে। আমি কেনে আঙুল দিয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই বাসা থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া মনে হয় আর কোন গতি নেই। লাবলুটার কি অবস্থা হবে সেটাই চিন্তা। মাঝে মাঝে বাবা মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের ত্যাজ্যপুত্র করে দেয়, ত্যাজ্যবাবা করে দেওয়ার কি কোন নিয়ম নেই?

রাত্রে খাবার পর বাবা আমাকে আর লাবলুকে পিটালেন। সাধারণতঃ তাই করেন, খেয়ে মনে হয় আগে একটু জোর করে নেন। তারপর আমাদের বলেন বই নিয়ে আসতে। আমরা বই নিয়ে এসে বসি, তারপর আমাদের ইংরেজি বানান জিজ্ঞেস করতে শুরু করেন। একটার পর আরেকটা, যতক্ষণ না আটকে যাই। আমাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, "লেফটেনেন্ট", সেটা জানতাম। ঠিক ঠিক বলামাত্র বাবার মুখ রাগে কালো হয়ে গেল। তখন জিজ্ঞেস করলেন "নিমোনিয়া", সেটাও ঠিক ঠিক বলে ফেললাম। তখন বাবা আরও রেগে গেলেন, দাঁত কিড়মিড় করে জিজ্ঞেস করলেন "ইউক্যালিপ্টাস", আমি আটকে গেলাম। সাথে সাথে বাবার চোখগুলো জ্বলে উঠল একশ ওয়াটের বাতির মত। মুখে লোল টেনে বললেন, শয়তানের বাচ্চা, বদমাইশের ধাড়ী, পড়াশোনা নেই, নামাজ রোজা নেই, দিনরাত শুধু ঘোরাঘুরি, আজকে যদি আমি

তোর জান শেষ না করি।

শিউলী গাছের ডালটা আগেই ভেঙে এনেছিলেন, সেটা আমার উপর দিয়ে গেল। আমি গরুর মত চিৎকার করতে করতে একটা ভীড় জমানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। কোন লাভ হল না। আশেপাশে যারা থাকে তারা জানালা খুলে মজা দেখতে লাগল। লাবলুটাকে এত ট্রেনিং দেয়ার পরও কোন লাভ হল না। মাথা নিচু করে ফোঁসফোঁস করে কাঁদতে কাঁদতে মার খেয়ে গেল। চিৎকার করে না বলে বাবা ঠিক বুঝতে পারেন না মারটা ঠিকমত লাগছে কি না, বাবা মনে হয় তাই গাধাটাকে আরো জোরে জোরে মারেন।

আমাদের পেটানোর পর বাবার এক রকমের আরাম হয়। খানিকক্ষণ তখন হাসি হাসি মুখ করে মায়ের সাথে সাংসারিক কথাবার্তা বলেন। তারপর বাজারের ব্যাগটা নিয়ে বের হয়ে যান। আজকেও বের হয়ে গেলেন। কোথায় যান কাউকে বলে যান না, কিন্তু আমরা সবাই জানি। বাবার বাজারের ব্যাগ বোঝাই করা থাকে ওষুধ। যেখানে কাজ করেন সেখান থেকে চুরি করে আনেন। বাবা এই ওষুধগুলি বিক্রি করতে যান। মীনা ফার্মেসীর মতি মিয়ার সাথে ঠিক করে রাখা আছে, বাবা ওষুধগুলি তাদের কাছে কম দামে বিক্রি করে আসেন।

বাবা ফিরে আসার আগেই আমি আর লাবলু শুয়ে পড়ি। শুয়ে শুয়ে শুনি বাবা ঘরে ঢুকছেন। ঘুমানোর আগে বাবা চা খান। চা খেয়ে ওজু করেন, আবার অনেকক্ষণ সময় নিয়ে বিকট শব্দ করতে করতে জিব পরিষ্কার করেন। তারপর এশার নামাজ পড়েন। আমি আর লাবলু শুয়ে শুয়ে শুনি বাবা সুর করে করে সূরা পড়ছেন। বাবা কখনো নামাজ কাজা করেন না। মনে হয় অনেক রকম চুরিচামারি করেন, সেই সব পাপ কাটানোর জন্যে তাঁকে অনেক নামাজ পড়তে হয়।

লাবলু বিছানায় শুয়ে ফোঁসফোঁস করে কাঁদে। আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। চাপা গলায় আদর করে, কিছু একটা বলে মনটা ভাল করার চেষ্টা করি। কিন্তু কোন লাভ হয় না। এই গাধাটা কাঁদতেই থাকে। যদি কোনদিন বাসা থেকে পালাই মনে হয় লাবলুটাকে নিয়েই পলাতে হবে। কি যন্ত্রণা!

২. সলীল

আমাদের ক্লাসে তিন রকমের ছেলে রয়েছে। এক রকমের ছেলে হচ্ছে ভাল ছেলে। তারা মন দিয়ে পড়াশোনা করে, তাদের চুল নিখুঁতভাবে আচড়ানো থাকে। তাদের জামা কাপড় হয় ধবধবে পরিষ্কার, তারা কখনও হোম ওয়ার্ক আনতে ভুলে না, তাদের হোম ওয়ার্কে কখনো কোন ভুল থাকে না। তারা কখনো খারাপ কথা বলে না, মারপিট করে না, রাস্তা থেকে আচার কিনে খায় না। তাদের বাবারা সাধারণতঃ সাবজজ, না হয়

ম্যাজিস্ট্রেট, না হয় জেলর। তাদের সাথে মারপিট করলে তাদের বাবারা হেডমাস্টারের কাছে দারোয়ান দিয়ে কড়া চিঠি লিখে পাঠান। তারা সবাই বড় লোকের ছেলে, সেজন্য তাদের চেহারা ছবিও ভাল।

আরেক ধরনের ছেলে আছে, তারা সবকিছুতেই মাঝারি। তারা পড়াশোনাতে সেরকম ভাল না, তাদের কাপড় চোপড়ও সাদাসিধে, কথাবার্তাও খুব সাধারণ। তারা স্কুলে বেশি কথাবার্তা বলে না, ঝগড়াঝাটি করে না, তাদের ধাক্কা দিলে মুখ কাচুমাচু করে সরে যায়। তাদের বাবারা সাধারণত গরিব মানুষ, স্কুলের মাস্টার, অফিসের কেরানী না হয় দোকানদার। নিরীহ বলে যে একটা কথা আছে সেটা মনে হয় তৈরিই করা হয়েছে এই ছেলেদের জন্যে।

আমাদের ক্লাসে তিন নম্বরের ছেলেরা হচ্ছে ডানপিটে ধরনের ছেলে। তারা শার্টের হাতা উল্টো করে ভাঁজ করে রাখে, তাদের চুল ঝাউ গাছের মত উঁচু হয়ে থাকে। তারা সাধারণত পড়াশোনা করে না, অবসর সময়ে তারা সিনেমার নায়িকাদের নিয়ে গল্প করে। ক্লাসে যখন স্যার থাকেন না তারা তখন নিরীহ ছেলেগুলিকে জ্বালাতন করে।

আমি প্রথমে চেষ্টা করেছিলাম এক নম্বর ছেলেদের দলে যেতে, সেটা সম্ভব হল না। দেখলাম, আস্তে আস্তে দুই নম্বর দলে চলে যাচ্ছি। তাই কয়দিন থেকে চেষ্টা করছি তিন নম্বর দলে যেতে। ব্যাপারটা যত সোজা ভেবেছিলাম আসলে তত সোজা না। তিন নম্বর দলে থাকলে মাঝে মাঝে কাঁঠাল গাছের নিচে বসে সিগারেট টানতে হয় আমি জানতাম না।

আমাদের ক্লাসে শুধু একটা ছেলে আছে যে একই সাথে তিন দলেই থাকতে পারে। সেটা হচ্ছে সলীল। এমনিতে পড়াশোনা করে না, গত বছর হঠাৎ দুম্ করে পরীক্ষায় থার্ড হয়ে গেল। অংকে ৯৮, ইংরেজিতে ৮৪। আমরা একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম, কিন্তু সলীল দেখি মোটেও অবাক হল না, বরং তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল সেটাই খুব স্বাভাবিক। কিন্তু পরীক্ষায় থার্ড হয়েও সে এক নম্বর দলে গেল না। এক নম্বর দলে যেতে হলে বড়লোকের ছেলে হতে হয়, পরিষ্কার কাপড় পরতে হয়, সবচেয়ে বড় কথা, বাবাদের জজ ম্যাজিস্ট্রেট হতে হয়। সলীলের বাবা তালেব উকিলের মুহুরী। তার বাবা বড়লোক না হলেও সলীলের চেহারা খুব ভাল। গতবার স্কুলে যখন নাটক হল স্যারেরা তাকে রাজপুত্রের পার্ট দিয়েছিলেন শুধু চেহারা দেখে। সে আবার নিরীহ দলের না। যেদিন কাসেম সলীলের ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, এই মালাউনের বাচ্চা, সলীল কোন কথা না বলে কাসেমের কলার ধরে তাকে দরজার সাথে ঠেসে ধরে বলল, রাজাকারের ছাও, আরেকবার এই কথা বলবি তো এক ঘুষিতে দাঁত খুলে নেব।

কাসেম তিন নম্বর দলের, আমাদের ফুটবল টিমের হাফ ব্যাক। তার গায়ে হাত দিতে সাহস দরকার, শক্তিরও দরকার। সলীলের সাহস আছে সেটা নিয়ে কারো কোন সন্দেহ নেই। শক্তি আছে কিনা সেটা কোনদিন ভাল করে প্রমাণ হয়নি। মনে হয় সেটা

পরীক্ষা করে দেখার মত সাহস কারো নেই।

সলীলের সাথে আমার বেশ বন্ধুত্ব আছে। আমার যেরকম গল্প বই পড়ার শখ সলীলেরও তাই। ছোটদের পড়া নিষেধ উপন্যাসগুলি সলীল জানি কিভাবে কিভাবে জোগাড় করে আনে। নিজে রাত জেগে পড়ে, পড়া শেষ হলে আমাকে পড়তে দেয়, আমি ছাদে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ি। বাবা এমনিতেই যা মারতে পারেন, এরকম একটা উপন্যাস পড়তে দেখলে যে আমার কি অবস্থা করবেন চিন্তা করলেই কাল ঘাম ছুটে যায়।

মোটাসোটা জমজমাট একটা উপন্যাস পেলেই সলীল আমার জন্যে আলাদা করে রাখে। আজকেও অংক ক্লাসের ফাঁকে খবরের কাগজে মোড়া একটা বই আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, এক নম্বর জিনিস।

বইটার নাম 'নীল নয়নার অভিসার'। আমি বইটা উল্টেপাল্টে দেখে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ফেরৎ দিয়ে বললাম, এখন না।

সলীল অবাক হয়ে বলল, কেন?

বাবা এসেছে। এক সপ্তাহ থাকবে।

সত্যি?

হ্যাঁ। আমি শার্টের কলার সরিয়ে দেখালাম। শিউলী গাছের ডাল দিয়ে মেরে বাবা কেমন করে গলার কাছে রক্ত জমিয়ে ফেলেছেন।

সলীল ভুরু কুচকে মাথা নাড়ল, কিছু বলল না। এই জন্যে সলীলকে আমার ভাল লাগে, তার ভিতরে মনে হয় একটু মায়াদয়া আছে। অন্য যে কেউ হলে দাঁত বের করে হেসে বলত, এই, দেখ্ দেখ্, মুনীরকে তার বাবা কেমন বানিয়েছে! সবাই তখন ছুটে আসত দেখার জন্যে যেন কত বড় মজা হয়েছে।

টিফিনের ছুটিতে সলীল শার্টের কলার সরিয়ে গলাটা আরেকবার দেখে বলল, এইভাবে মারল? কি করেছিলি?

কিছু না।

কিছু না?

না।

ভগবানের কীরা?

ভগবানের কীরা। খোদার কসম।

সলীল অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, তোর বাবার নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে।

কি গোলমাল?

স্যাডিস্টিক।

সেটা কি জিনিস?

যারা অন্য মানুষকে অত্যাচার করে আনন্দ পায়। আমি বইয়ে পড়েছি। এটা হচ্ছে

স্যাডিস্টিক ব্যবহার।

ব্যাপারটা অসম্ভব কিছু না। সলীল আমার থেকে অনেক বেশি বই পড়ে, এই সব ব্যাপার কোন বইয়ে পড়ে ফেলবে, বিচিত্র কি। বাবার মেরে আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটির একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে জানার পরও অবিশ্যি আমার খুব একটা স্বস্তি হল না। আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, মনে হয় কোনদিন বাসা থেকে পালিয়ে যেতে হবে।

সলীল হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, সত্যি?

সত্যি।

আমারও মাঝে মাঝে এত ইচ্ছা করে পালিয়ে যেতে।

কেন? তুই কেন পালিয়ে যাবি? তোর বাবা কি পেটায়?

না, সেরকম কিছু না। কিন্তু অন্য রকম অশান্তি আছে।

কি অশান্তি?

এই কত রকম অশান্তি — সলীল হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভান করল। নিশ্চয়ই আমাকে বলতে চায় না, আমি তাই আর জোর করলাম না।

সলীল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, সত্যি পালাবি?

আমি একটু অবাক হয়ে সলীলের দিকে তাকালাম। তার চোখ দুটি কেমন জানি চকচক করছে। দেখে আমার কোন সন্দেহ হল না যে সলীল সত্যি সত্যি কোথাও পালাতে চায়। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় পালাবি?

কত জায়গা আছে! গয়না নৌকা করে ভাটি এলাকায় যেতে পারি। কি সুন্দর! দেখলে তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। একেবারে কাঁচের মত জল, নিচে দেখবি গাছপালা ঝোপঝাড়। মাইলের পর মাইল —

তুই কেমন করে জানিস?

বাবার কাছে শুনেছি। বাবা ভাটি এলাকা থেকে এসেছে। যদি সেখানে না যেতে চাস তাহলে সমুদ্রে যেতে পারি। ট্রলারে করে মহেশখালি, না হয় কুতুবদিয়া, না হয় সেন্ট মার্টিন্স, নীল জল, দূর পাহাড়ে! আহ্! সলীল জিব দিয়ে এরকম শব্দ করল, মনে হল যেন পুরো দৃশ্যটা চেখে খাচ্ছে।

সমুদ্রে যদি যেতে না চাস — সলীলের চোখ হঠাৎ আবার চকচক করতে থাকে, তাহলে আমরা বেদে নৌকা করে যেতে পারি। বেদের নৌকা দেখিসনি? সাপের ঝাঁপি নিয়ে আসে? তাদের সাথে ঘুরে বেড়াবি। সাপের খেলা দেখাবি! সাপের মন্ত্র বিক্রি করবি।

বেদের নৌকা? আমি অবাক হয়ে বললাম, তোকে নেবে কেন?

কেন নেবে না?

তুই কি বেদে?

বেদে হয়ে যাব।

আমি হি হি করে হাসলাম, ধুর গাধা! ইচ্ছে করলেই কি বেদে হওয়া যায়?

সলীল কেমন জানি আনমনা হয়ে তাকিয়ে থাকে। তাকে দেখে হঠাৎ মনে হয় বেদে হয়ে জন্ম হয়নি বলে তার জীবনে বুঝি খুব বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেছে।

৩. সাহেব বাড়ি

রশীদ স্যার আমাদের ইতিহাস পড়ান। আসল ইতিহাস মনে হয় খারাপ না, কিন্তু আমাদের ক্লাসে যে জিনিসটা পড়ানো হয় তার থেকে জঘন্য আর কিছু হতে পারে না, রাজা বাদশাহ নিয়ে বানানো সব গালগল্প। সলীল একবার কোথা থেকে একটা বই জোগাড় করে এনে দিয়েছিল, বইয়ের নাম "প্রাচীন পৃথিবীর সভ্যতা", সে যে কি সাংঘাতিক একটা বই! পড়লে মনেই হয় না ইতিহাস পড়ছি, মনে হয় রহস্য উপন্যাস পড়ছি। মিশরের ফারাওদের কাহিনী, কেমন করে মমি তৈরি করত তার ইতিহাস, দক্ষিণ আমেরিকার মায়াদের কাহিনী, কেমন করে প্রত্যেকদিন হাজার হাজার মানুষের বুক কেটে হৃদপিণ্ড বের করে সূর্য দেবতাকে উৎসর্গ করত তার বর্ণনা, রোমানদের গল্প, ক্রীতদাসের বিদ্রোহের কি সাংঘাতিক একটা কাহিনী! কিন্তু আমাদের ক্লাসে সেসব কিছুই পড়ানো হয় না। রশীদ স্যার মনে হয় ব্যাপারটা টের পেয়েছেন, তাই আমাদের কিছু পড়ানোর চেষ্টা করেন না। ক্লাসে এসে চেয়ারে দুই পা তুলে একটা বিচিত্র ভঙ্গিতে বসে পড়েন, দেখে মনে হয় এভাবে বসতে বুঝি খুব আরাম। তারপর ইতিহাস বইটা হাতে নিয়ে বলেন, বাহান্ন পৃষ্ঠা থেকে ষাট পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড় মনে মনে। গোলমাল করবি না। খবরদার।

আমরা প্রথমে একটু সময় পড়ি, তারপর নিজেরা নিজেরা ফিসফিস করে কথা বলি, চুপি চুপি চোর পুলিশ খেলি। যাদের কাছে ডিটেকটিভ বই আছে ইতিহাস বইয়ের উপর রেখে পড়তে শুরু করি। মজিদ স্যার মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে বলেন, কোন কথা না, খবরদার।

আমরা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার কথা বলতে শুরু করি। কোন রকম কথা না বলে কেমন করে থাকে একজন মানুষ? সলীল আমার পাশে বসেছিল, গলা নামিয়ে বলল, এক জায়গায় যাবি আজ?

কোথায়?

সাহেব বাড়ি।

সেটা কোনখানে?

মজিদ স্যার আবার হুঙ্কার দিলেন, খবরদার, আর কোন কথা না। জবাই করে ফেলব।

সলীল তাই আর কথা বলতে পারল না। চোখ নামিয়ে বুঝিয়ে দিল সাহেব বাড়ি

হচ্ছে রহস্যময় এক বাড়ি।

সলীলের এটা প্রায় নেশার মত হয়ে গেছে। রহস্যময় জিনিসের জন্যে সে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়! রহস্যময় সব জিনিসে তার শখ। সত্যিকারের রহস্যময় জিনিস আর কয়টা আছে? কিন্তু সলীলের জন্যে সেটা কোন সমস্যা না, সাধারণ একটা জিনিসকে সে সাংঘাতিক একটা রহস্যময় জিনিস হিসেবে কল্পনা করে নিতে পারে। সবার কাছে যেটা মনে হয় জংলা জায়গায় ভাঙা একটা বাড়ি সলীল সেটা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। তার চোখ চকচক করতে থাকে, উত্তেজনায় কথা বলতে পারে না। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলে, ইশ! কি সাংঘাতিক! কি সাংঘাতিক!

সলীলের সাথে ঘুরে ঘুরে আমারও এখন একটু অভ্যাস হয়েছে। ব্যাপারটা আসলে কঠিন না। প্রথমে অনেক বই পড়তে হয়। বইয়ে নানা রকম বিচিত্র কাহিনী থাকে, সেগুলি জানা থাকলে কল্পনা করা খুব সোজা। ভাঙা একটা বাড়ি দেখে সলীল বলে, দেখ, দেখ একেবারে আজটেক মন্দিরের মত!

আমিও মাথা নেড়ে বলি, হ্যাঁ, ঐ ওপরে নিশ্চয়ই পুরোহিত দাঁড়াত পাথরের চাকু নিয়ে?

হ্যাঁ, আর ঐ বারান্দায় মানুষকে শোওয়াতো বলি দেয়ার জন্যে। মানুষ আর মানুষ দাঁড়িয়ে থাকত চারিদিকে। হাত তুলে গান গাইত —

আমি আর সলীল তখন বিচিত্র একটা শব্দ বের করতে শুরু করে দিই, যেন প্রাচীন মানুষ গান গাইছে! ব্যাপারটা খারাপ না।

সলীলের রহস্যময় বাড়িটাও সেরকম একটা কিছু হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে হয় সেখানে যাওয়াটা খারাপ না। আজ হাফ স্কুল, দুপুরে ছুটি হয়ে যাবে। সন্ধ্যের ট্রেনে বাবা ঢাকা ফেরৎ যাবে, তার আগে এমনিতেই বাসায় ফিরে যাওয়ার তো কোন মানেই হয় না। খামাখা আরেক চোট মার খাওয়া।

স্কুল ছুটির পর আমি আর সলীল নদীর তীর ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। নদীর মনে হয় এক ধরনের যাদু আছে। এর কাছে আসলেই মন ভাল হয়ে যায়। এর কারণটা কি কে জানে? মনে হয় অনেক খোলামেলা, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় সে জন্যে। যখন বড় কোন নৌকা যায় তখন আমি আর সলীল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, কি যে ভাল লাগে দেখতে! মাঝিরা দাড় টানছে, বড় লগি দিয়ে দুজন দুপাশ থেকে ঠেলছে, বুড়ো মাঝি শক্ত করে হাল ধরে রেখেছে। নৌকার মাঝেই এক কোণায় একজন রান্না বসিয়েছে, কি আশ্চর্য রহস্যময় ব্যাপার!

নদীর তীর ধরে হেঁটে হেঁটে কদমতলা পর্যন্ত এসে ব্রীজের ওপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হয়ে এলাম। নদীর এপাশে আরো অনেকদূর হেঁটে লাশকাটা ঘর পার হয়ে চালমারী পাহাড়ের পিছন দিয়ে গিয়ে, দুটো সর্ষে ক্ষেতের পর ছোট খালটা পার হয়ে বেশ জংলা মতন একটা জায়গায় সলীল এসে থামল। অকারণে গলা নামিয়ে বলল, এটা সাহেব

বাড়ি।

বাড়ি কই?

ঐ যে দেখিস না?

আমি তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই গাছপালার ভিতরে একটা পুরানো দালান। দেখে মনে হয় ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। চারিদিক থেকে গাছ বের হয়ে এসেছে লতাপাতায় ঢাকা। দেখেই কেমন জানি না গা ছমছম করতে থাকে। সলীল ফিসফিস করে বলল, কি সাংঘাতিক না?

আমি মাথা নাড়লাম।

আয়, আরেকটু কাছে যাই।

কার বাড়ি এটা।

জানি না।

কেউ থাকে এখানে?

ধুর! কেমন করে থাকবে? দেখিস না এটা পোড়াবাড়ি। কি রকম ছমছমে দেখেছিস? কি সাংঘাতিক! তাই না?

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

আয় ভিতরে যাই।

ভিতরে? আমি চমকে উঠে বললাম, ভিতরে যাবি?

কেন যাব না? দেখে আসি।

আমার ঠিক ইচ্ছে হচ্ছিল না কিন্তু তবু সলীলের উৎসাহে এগিয়ে গেলাম। বাসার পিছন দিকে একটা ভাঙা সিঁড়ি পাওয়া গেল, গাছপালা লতাপাতায় ঢাকা। সলীল বলল, চল উপরে উঠি।

কার না কার বাসা!

কেউ থাকে না এখানে। আর আমরা তো চুরি করতে যাচ্ছি না, দেখতে যাচ্ছি।

আমি বাধ্য হয়ে সলীলের সাথে সাথে ওপরে উঠতে থাকি। ওপরে একটা বারান্দা মত পাওয়া গেল। সেখান দিয়ে আরেকটা সিঁড়ি বেয়ে মনে হল ছাদের দিকে যাওয়া যায়। দুজনে রওনা দিয়েছি, হঠাৎ করে কে যেন কানের কাছে বলল, কি খোকা, কাকে চাও?

আমি আর সলীল এমন চমকে উঠলাম সে আর বলার মত নয়। আরেকটু হলে এত জোরে লাফিয়ে উঠতাম, নিশ্চয়ই একেবারে ছাদে মাথা ঠুকে যেতো। অনেক কষ্টে নিজেদের শান্ত করে ঘুরে তাকিয়ে দেখি, একজন অদ্ভুত মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষটা শুকনো মতন, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, মাথায় কাঁচা পাকা চুল। দেখে মনে হয়, কলেজের প্রফেসর কিন্তু গায়ের জামা কাপড় বাচ্চা ছেলেদের মত! রঙিন একটা শার্ট, তার সবগুলি বোতাম খোলা। ভিতরে একেবারে অসম্ভব পরিষ্কার একটা গেঞ্জি, যেন এইমাত্র কিনে এনে পরেছে। নীল রঙের ঢুলঢুলে একটা প্যান্ট,

পায়ে টেনিস শু। হাতে খুব চকচকে একটা ঘড়ি, দেখে মনে হয় খুব দামী। মানুষটাকে একই সাথে খুব শিক্ষিত একজন ভদ্রমানুষ আবার কেমন জানি পাগল পাগল মনে হচ্ছে। সবচেয়ে বিচিত্র হচ্ছে একটা লাল গামছা, যেটা তার গলা থেকে ঝুলছে। রিকশাওয়ালা, কুলী বা চাষীরা যেভাবে গামছা ঝুলিয়ে রাখে সেরকম।

আমাদের খানিকক্ষণ লাগল সামলে নিতে। সলীল সামলে নিল আগে, আমতা আমতা করে বলল, না মানে ইয়ে—

কাউকে খোঁজ করছ? লোকটার গলার স্বর খুব ভাল। টেলিভিশনে যারা খবর পড়ে তাদের মত।

সলীল আবার মাথা নাড়ল, উহু। কাউকে খোঁজ করছি না।

আমি ভয়ে ভয়ে লোকটার দিকে তাকালাম। এখনই নিশ্চয়ই বাঁজখাই গলায় একটা ধমক দেবে, সেই ধমকে আমরা নিশ্চয়ই দিশেহারা হয়ে ছুটে পালাব। কিন্তু লোকটা ধমক দিল না। বরং মনে হল একটু হেসে দিল। হেসে বলল, তোমরা কারা? এখানে কি মনে করে?

আমি বললাম, ইয়ে, মানে—

কোন কাজে, নাকি এমনি?

এমনি।

বেশ বেশ। লোকটা চশমা খুলে তার লাল গামছা দিয়ে খুব যত্ন করে তার চশমাটা পরিষ্কার করতে শুরু করল। তারপর আবার চোখে দিয়ে বলল, কাজের অনেক সময় পাবে বড় হলে। এখন এমনিতেই ঘুরোঘুরি কর। সেটাই ভাল।

লোকটাকে বদমেজাজি মনে হচ্ছে না, হয়তো ধমক দিয়ে আমাদের বিদায় করে দেবে না। আমি সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখানে থাকেন?

আমি? সব সময় থাকি না। মাঝে মাঝে থাকি।

সলীলের চোখ চকচক করে উঠে, কি সুন্দর বাসা!

সুন্দর? লোকটি অবাক হয়ে সলীলের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ। কি সুন্দর চারিদিকে। গাছপালা নির্জন সুমশাম!

নির্জন? সুমশাম?

হ্যাঁ। এটা কি আপনার নিজের বাসা?

আমার পূর্বপুরুষের ছিল। এখন আমার। কিছুদিনের জন্যে আমার।

তারপরে?

তারপরে জানি না কি হবে। লোকটা একটা নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর লাল গামছা দিয়ে মুখ মুছে বলল, এখন আমার চা খাওয়ার সময়। তোমরা কি খাবে এক কাপ চা আমার সাথে?

আমি সলীলের দিক তাকালাম। একেবারে অপরিচিত একজন মানুষের সাথে চা খাওয়া কি ঠিক হবে? বাবাকে দেখেই কিনা জানি না, বড় মানুষদের আমার কেন জানি

বিশ্বাস হয় না, শুধু মনে হয়, নিশ্চয়ই কোন রকম বদ মতলব আছে। এই লোকটাকে দেখে অবিশ্যি কেমন জানি ভাল মানুষের মত মনে হচ্ছে। আমরা তাই আর না করতে পারলাম না। লোকটির পিছনে হেঁটে হেঁটে পাশের একটা ঘরে ঢুকলাম। বাইরে থেকে দেখে যেরকম মনে হয় বাসাটি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, ভিতরে কিন্তু সেরকম খারাপ না। ঘরের মাঝে কোন আসবাব নেই, মাঝখানে শক্ত একটা কাঠের টেবিলের উপরে একটা স্টোভ, সেই স্টোভে কুচকুচে কালো একটা কেতলি। লোকটি স্টোভটা বারকয়েক পাম্প করে জ্বালিয়ে দিল, শোঁ শোঁ শব্দ করে সেখান থেকে নীল আগুন বের হতে থাকে। কেতলিতে খানিকটা পানি ভরে লোকটি স্টোভের উপর চাপিয়ে দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, স্কুল থেকে আসছ?

আমাদের হাতে বই, কাজেই আমরা যে স্কুল থেকে আসছি বোঝা খুব কঠিন নয়। আমরা মাথা নাড়লাম।

কোন ক্লাসে পড়?

সেভেন।

ভেরী গুড। ভেরী গুড। লোকটার মুখ কেন জানি খুব খুশি খুশি দেখাতে থাকে। ক্লাস সেভেনে পড়া কেন এত খুশির ব্যাপার আমি ঠিক ধরতে পারলাম না।

নাম কি তোমাদের?

আমি সলীল।

আমি মুনীর।

ভেরী গুড। ভেরী গুড। লোকটা মনে হল আরো বেশি খুশি হয়ে গেল। মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বলল, আমার নাম জহুরুল চৌধুরী। প্রফেসর জহুরুল চৌধুরী।

জহুরুল নামটা সলীল ঠিক ধরতে পারল না, জিজ্ঞেস করল, প্রফেসর জারুল চৌধুরী?

লোকটা হা হা করে হেসে উঠে বলল, জারুল? ভালই বলেছ। জারুল! জারুল চৌধুরী! প্রফেসর জারুল চৌধুরী। হা হা হা . . .

আমি সলীলকে ধাক্কা দিয়ে বললাম, গাধা! জারুল না, জহুরুল। জহুরুল চৌধুরী।

ও। ও। সলীল একটু লজ্জা পেয়ে বলল, জহুরুল—

লোকটি মাথা নেড়ে সলীলকে থামিয়ে দিয়ে বলল, না না, জারুলই ভাল! চমৎকার নাম। গাছের নামে নাম। জারুল চৌধুরী খুব ভাল শোনায়! কি বল?

বোঝাই যাচ্ছে মানুষটা একটু পাগলা গোছের, কিন্তু ভাল মানুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোকটা হাসিমুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, আজ থেকে তোমাদের কাছে আমার নাম জারুল চৌধুরীই হোক। প্রফেসর জারুল চৌধুরী।

আমি একটু ইতঃস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কিসের প্রফেসর?

আমি ম্যাথমেটিক্সের প্রফেসর। গণিতশাস্ত্রের। অংকের। অংক ভাল লাগে তোমাদের?

অংক ভাল লাগে সেরকম কোন মানুষ কি সত্যি হওয়া সম্ভব? আমরা তবু ভদ্রতা করে মাথা নাড়লাম, বললাম, জী। ভাল লাগে।

ক্লাস সেভেনে কি অংক শেখায় তোমাদের? ক্যালকুলাস?

আমরা মাথা নাড়লাম, না।

প্রফেসর জারুল চৌধুরী মনে হল খুব অবাক হলেন। ক্যালকুলাস শেখায় না? ভারি আশ্চর্য। যত ছোট থাকতে সম্ভব ক্যালকুলাস শেখানো উচিৎ। ছোটরা শিখবে খুব সহজে। আমি ভেবেছিলাম একটা বই লিখব, নাম দিব "শিশুদের ক্যালকুলাস"।

প্রফেসর জারুল চৌধুরী তাঁর বইয়ের বিষয়বস্তু কি হবে সেটা আমাদের বোঝাতে শুরু করলেন। আমরা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, তবু মাথা নাড়তে থাকলাম।

কেতলিতে পানি গরম হয়ে যাবার পর প্রফেসর জারুল চৌধুরী আমাদের টিনের মগে চা তৈরি করে দিলেন। একটা প্যাকেট থেকে খানিকটা মুড়ি বের করে দিয়ে বললেন, স্কুল থেকে এসেছ, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। আমার কাছে তো মুড়ি ছাড়া আর কিছু নাই। মুড়ি খাও তো তোমরা?

জী খাই।

আমরা মুড়ি খেতে খেতে চায়ে চুমুক দিলাম। টিনের মগে চা খেতে হয় খুব সাবধানে, ঠোঁট পুড়ে যায় খুব সহজে। চায়ে কি চমৎকার গন্ধ! মনে হল পায়েশ খাচ্ছি। আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, আপনি কলেজের প্রফেসর?

হুঁ। প্রফেসর জারুল চৌধুরী মাথা নাড়লেন, এক সময়ে ছিলাম। এখন আর না।

রিটায়ার করেছেন?

বলতে পার এক ধরনের রিটায়ার।

আমরা চা খেতে খেতে প্রফেসর জারুল চৌধুরীর সাথে কথা বলতে লাগলাম। একজন প্রফেসর, তাও যাতা প্রফেসর না, অংকের প্রফেসর, আমাদের সাথে এমনভাবে কথা বলছেন যেন আমরা ছোট নই, তাঁর সমবয়সী! আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

আমরা হয়তো আরো কিছুক্ষণ কথা বলতাম কিন্তু হঠাৎ টেবিলের নিচে পা লেগে কি একটা পড়ে গেল, আমি মাথা নিচু করে দেখি, একটা ছোট বাক্স, ভিতরে ভাঙা কাঁচের বোতল। জারুল চৌধুরী বললেন, ওটা কিছু নয়। ভাঙা কাঁচের টুকরা। ঘরের ভিতরে রাখাই ঠিক হয়নি।

ভাঙা কাঁচ দিয়ে কি করবেন?

সূতায় মাঞ্জা দেব।

আমি আর সলীল চোখ বড় বড় করে তাকালাম, কিসে মাঞ্জা দেবেন?

সূতায়। ঘুড়ির সূতায়। ঢাউস একটা ঘুড়ি কিনে এনেছি, এই এত বড়, জারুল চৌধুরী দুই হাত দিয়ে দেখালেন।

হঠাৎ করে আমার একটা সন্দেহ হতে থাকে, মানুষটা নিশ্চয়ই পাগল। তা না হলে

এরকম বয়স্ক একজন মানুষ সূতায় মাঞ্জা দিয়ে ঘুড়ি উড়ায়? হাতে দামী ঘড়ি পরে, গলায় গামছা ঝুলিয়ে রাখে? আমাদের মত বাচ্চা ছেলেদের সাথে এরকম ভাল ব্যবহার করে? আমি আড়চোখে সলীলের দিকে তাকালাম, দেখি তার মুখও কেমন জানি ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, সেও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। ঢোক গিলছে একটু পর পর।

চা প্রায় শেষ হয়ে আসছিল, আমি ঢকঢক করে বাকিটা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমাদের যেতে হবে। দেরি হয়ে গেছে।

সলীলও সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল। ঢোক গিলে বলল, হ্যাঁ। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

জাকুল চৌধুরী বাইরে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, মনে হয় দেরি হয়ে গেছে।

আমরা মাথা নেড়ে বইপত্র হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। ভয় হচ্ছিল, হাসিখুশি মানুষটা হঠাৎ বুঝি ক্ষেপে উঠে চিৎকার করে লাফিয়ে পড়বে। হাতে থাকবে একটা রাম দা, এক কোপে আমাদের গলা আলাদা করে দেবে। কিন্তু সেরকম কিছু হল না। আমাদের ভাল মানুষের মত দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে সলীল আর মুনীর, বাসায় যাও এখন। খুব ভাল লাগল তোমাদের সাথে কথা বলে।

আমি আর সলীল গুটিগুটি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। নদীর ঘাটে এসে সলীল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মানুষটা আসলে পাগল। তাই না?

আমি মাথা নাড়লাম। কেমন জানি আমার একটু মন খারাপ হল।

বাসায় এসে দেখি, ট্রেন ফেল করেছেন বলে বাবা ঢাকা যেতে পারেননি। আমাকে দেখে তাঁর চোখ কেমন জানি চকচক করে উঠল। মুখে লোল টেনে বললেন, আয় হারামজাদা, আজ বাসায় আয়। কখন স্কুল ছুটি হয়েছে আর তুই এখন বাসায় আসিস? আজকে তোর একদিন কি আমার একদিন।

শিউলী গাছের নিচের ডালগুলি সব ভেঙে শেষ করে নেয়া হয়েছে, বাবাকে অনেক কষ্ট করে উপর থেকে একটা ডাল ভাঙতে হল।

তারপর আমাকে যা একটা মার মারলেন, সেটা আর বলার মত না।

৪. জয়নাল

সকালে স্কুলে যাবার সময় দেখি জয়নাল আমাদের বাসার সিঁড়িতে বসে আছে। জয়নাল আমাদের বাড়িওয়ালার কাজের ছেলে। আমাদের বাড়িওয়ালা একজন উকিল, নাম গজনফর আলী, সবাই গজু উকিল বলে ডাকে। উকিল সাহেবের মনে হয় পশার খুব বেশি নেই, সংসার চালানোর জন্যে তাঁর ওকালতি ছাড়াও আরো নানারকম

কাজকর্ম করতে হয়। আমরা তাঁর ভাড়া বাসাতে থাকি। শীতের সময় উকিল সাহেব গরুর গাড়ি করে গ্রাম থেকে ধান আনেন। তাঁর বাসায় একটা গাইগরু আছে, তিনি সেই গরুর দুধ বিক্রি করেন। জয়নালকে রাখা হয়েছে এই গরুটাকে দেখাশোনা করার জন্যে।

উকিল সাহেবের গরুটা খুব দুবলা, বাছুরটা তার থেকেও দুবলা। প্রত্যেকদিন সকালে দুধ দোওয়ানোর জন্যে বৃন্দাবন নামে একজন খুরখুরে বুড়ো মানুষ আসে। শুকনো হাড় জিরজিরে গরুটা থেকে বৃন্দাবন কিভাবে কিভাবে জানি ছোট একটা বালতিতে আধ-বালতি দুধ বের করে ফেলে। সেই দুধে পানি মিশিয়ে পুরো বালতি করে দুধ বিক্রি করা হয়। দুধে যে পানি মেশানো হয় সেই খবরটাও আমরা জয়নালের কাছে পাই। উকিল সাহেবের কথামত সেই মিশায়। দুধে নাকি একটু পানি মেশাতে হয়, একেবারে খাঁটি দুধ নাকি স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল না।

জয়নালের বয়স আমার থেকে বেশি হবে না, কিন্তু তাকে দেখায় অনেক বড়। প্রথম কারণ, সে সব সময় লুঙ্গি পরে থাকে, লুঙ্গি পরলে মানুষকে কেন জানি একটু বড় দেখায়। যখন আশেপাশে কেউ থাকে না তখন সে লুঙ্গির গোঁজ থেকে সিগারেট বের করে খায়। তার সিগারেট খাওয়াটা একটি দেখার মত দৃশ্য, চোখ বন্ধ করে এমন একটি ভাব করতে থাকে যেন সিগারেট নয়, রসগোল্লা খাচ্ছে!

জয়নাল এমনিতে খুব হাসিখুশি ছেলে। কিভাবে এত হাসিখুশি থাকে কে জানে! যেভাবে থাকে সেখানে হাসিখুশির কিছু নেই। আজকে অবিশ্যি তাকে হাসিখুশি দেখাচ্ছে না। সিঁড়িতে মুখটা গোমড়া করে বসে আছে, সামনে তার হাড়জিরজিরে গরু। গরুটার দড়ি তার হাতে। কাছেই বাছুরটা দাঁড়িয়ে আছে, গরুটা তার খসখসে জিব দিয়ে বাছুরটাকে চেটে যাচ্ছে, শব্দ শুনে মনে হয় চামড়া তুলে ফেলবে। বাছুরটার মুখে একটা উদাস উদাস ভাব, দেখে মনে হয় কেমন জানি এক ধরনের শান্তি এসে ভর করেছে!

আমি বললাম, কি রে জয়নাল!

জয়নাল আমার দিকে তাকিয়ে নালিশ করার ভঙ্গিতে বলল, শালার বাছুরটার কারবারটা দেখেছেন?

যদিও তার বয়স আমার কাছাকাছি তবুও সে আমাকে আপনি করে বলে, আমি তাকে তুই করে বলি। কাজের ছেলেদের এভাবেই বলা হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

দড়ি ছিঁড়ে রাত্রে সব দুধ খেয়ে ফেলেছে। পেটটা দেখেছেন?

আমি বাছুরটার দিকে তাকালাম। সত্যিই পেটটা ফুলে ছোট একটা ঢোলের মত হয়ে আছে। চেহারায় সে জন্যেই মনে হয় শান্তশিষ্ট ভালমানুষ সুখী সুখী চেহারা! আমি দাঁত বের করে হেসে বললাম, ঠিক করেছে! একফোটা দুধ খেতে দিস না বাছুরটাকে, দড়ি ছিড়বে না তো কি? মায়ের দুধ তো তার বাচ্চাই খাবে —

জয়নাল মুখ বাঁকা করে বলল, আর মারটা? সেটা কে খাবে?

আমি আর কথা বাড়ালাম না। বড়দের হাতে মার খাওয়া ব্যাপারটা শুধু আমার

জন্যে সত্যি না, আরো অনেকের জন্যে সত্যি। খানিকক্ষণ বাছুরের ঢোলের মত পেটটাকে দেখে স্কুলে যাচ্ছিলাম, জয়নাল পিছন থেকে ডেকে বলল, ভাই, মনির ভাই।

কি?

আজকে একটা চিঠি লিখে দেবেন?

যেহেতু জয়নাল লিখতে পড়তে পারে না, আমি তাকে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে দিই। সে তার বাড়িতে যখন টাকা পাঠায় আমি তার মানি অর্ডার ফরম ফিলআপ করে দিই। সহজে অবিশ্যি রাজি হই না, সবসময় প্রথমে খানিকক্ষণ গাঁইগুই করি। আজকেও শুরু করলাম, বললাম, আবার? সেই দিন না লিখে দিলাম?

সেইদিন কি বলেন? কার্তিক মাসে দিলেন। এখন অগ্রহায়ণ।

আমার বাংলা মাসের হিসেব ভাল থাকে না। মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে শেষে বললাম, ঠিক আছে, বিকালে নিয়ে আসিস।

জয়নাল একেবারে গলে যাওয়ার ভান করে বলল, ঠিক আছে মনির ভাই। ঠিক আছে।

বিকাল বেলা জয়নাল একটা মানি অর্ডার ফরম আর একটা ভুসেভুসে কাগজ নিয়ে হাজির হল। বারান্দায় বসে আমি তার মানি অর্ডার ফর্মে লিখতে থাকি। কত টাকা পাঠাচ্ছে জিজ্ঞেস করতেই হঠাৎ জয়নাল কেমন যেন অস্বস্তিতে একটু নড়েচড়ে বসল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কত পাঠাবি?

তিনশ।

তিনশ? আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, এত টাকা কোথায় পেয়েছিস?

জয়নালের বেতন কত আমি খুব ভাল করে জানি। উকিল সাহেব বলতে গেলে তাকে পেটে-ভাতে রেখেছেন। জয়নাল মুখ কাচুমাচু করে মাথা চুলকে বলল, পেয়েছি এক জায়গা থেকে।

কোন্ জায়গা থেকে?

জয়নাল আমতা আমতা করে বলল, বলা নিষেধ আছে মনির ভাই।

চুরি করেছিস?

সাথে সাথে জয়নালের মুখ কাল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মনির ভাই, আপনার তাই মনে হয়? মানুষ গরিব হলেই চুরি করে?

তাহলে বলছিস না কেন?

চুরি করিনি। জয়নাল জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, খোদার কসম চুরি করিনি। আল্লাহর কসম। খোদার কীরা।

তাহলে? তিনশ টাকা?

মনির ভাই, আমার বলা নিষেধ। আমি পেয়েছি এক জায়গায়। ন্যায্য টাকা।

হালাল রুজি। খোদার কসম।

ঠিক আছে। আমি মুখ শক্ত করে বললাম, আমাকে যদি বলতে না চাস বলিস না। আমি উকিল সাহেবকে জিজ্ঞেস করব।

সাথে সাথে জয়নালের মুখ একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়। একেবারে আমার হাত ধরে ফেলে বলল, আল্লাহর কসম লাগে আপনার মনির ভাই, উকিল সাহেবরে কিছু জিজ্ঞেস করেন না। যদি করেন আমার সব টাকা নিয়ে যাবে। গরিব মানুষের টাকা। এত কষ্টের টাকা—

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, তাহলে বল কোথায় পেয়েছিস।

জয়নাল বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনি কাউকে বলবেন না?

বলব না?

খোদার কসম?

খোদার কসম।

জয়নাল মাটি থেকে একটা কাঠি তুলে খুব মনোযোগ দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, আমি গরু নিয়ে নদীর পাড়ে যাই মাঝে মাঝে। নদীর ঘাটে মিনতির কাজ করে কিছু পোলাপান। একজনের নাম রশীদ।

জয়নাল পিচিক করে দাঁতের ফাক দিয়ে থুতু ফেলে বলল, রশীদ শালার সৎ মা। বাপ রিকশা চালায়। ভাত খাওয়ার পয়সা নাই। হঠাৎ দেখি নবাবের বাচ্চা একটা নতুন শার্ট আর লুঙ্গি পরে এসেছে। পকেটে চিরুণী। নদীর ঘাটে চায়ের দোকানে বসে মালাই দিয়ে চা খাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, টাকা কই পেলি? চুরি করেছিস? রশীদ কিরা কেটে বলল চুরি করে নাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে? প্রথমে বলতে চায় না, শালারে অনেক তেল মালিশ করলাম। তখন বলল।

কি বলল?

বলল, সুতরাপুরের কাছে গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিক আছে, সেখানে বড় ডাক্তারের নাম নাওয়াজ খান। নাওয়াজ খান দিয়েছেন।

নাওয়াজ খান টাকা দিয়েছেন?

জে।

কেন?

জয়নাল ঠোঁট উল্টে বলল, জানি না। নাওয়াজ খান সাহেব এমনিতে ফিরিশতার মত মানুষ। রোশনাই চেহারা। গরিব পোলাপানদের খুব আদর যত্ন করেন। কেউ যদি খান সাহেবের কাছে যায় খান সাহেব সাহায্য করেন। খালি কিরা কেটে বলতে হয় কাউরে বলা যাবে না। সেই জন্যে আপনারে বলতে চাই নাই।

কাউকে বলা যাবে না?

না।

কি বলা যাবে না?

এই যে টাকাপয়সা দেন, সাহায্য করেন—সেই কথা।

কেন?

ফিরিশতার কিসিমের মানুষ, জানাজানি করতে চান না মনে হয়।

গেলেই টাকা দেন?

জয়নাল একটু আমতা আমতা করে বলল, গেলেই সব সময় দেন না। মাঝে মাঝে দেন। কেউ বেশি কেউ কম?

কেউ বেশি কেউ কম?

জে।

কেন?

জয়নাল মাথা নেড়ে বলল, খান সাহেবের ইচ্ছা!

আমি তবু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, যার বেশি দরকার তাকে বেশি?

জে না। সেইভাবে না।

তাহলে কিভাবে?

নাওয়াজ খান সাহেব আগে সবাইকে টিপে টুপে পরীক্ষা করেন। তারপর রক্ত পরীক্ষা করেন। এক্স-রে করেন। একটা ছোট বোতলে পেশাব করে দিতে হয়। সেই সব কিছু পরীক্ষা করেন। একটা কাগজে তারপর নাম ঠিকানা লিখেন। ক্যামেরা দিয়ে ফটো তুলেন তখন। তারপরে—

তারপরে কি?

তারপরে টাকা দেন। কেউ বেশি কেউ কম। খালি একটা শর্ত।

কি শর্ত?

যখন নাওয়াজ খান সাহেব খবর পাঠাবেন তখন যেতে হবে।

আমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

জানি না। সব ঠিক আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখেন মনে হয়।

তুই কি বেশি পেয়েছিস না কম?

জয়নাল দাঁত বের করে হেসে বলল, বেশি।

আমি জয়নালের কথা শুনে একটু অবাক হলাম। নানা রকম সন্দেহ হল, কিন্তু একটা ছেলের রক্ত, কফ, পেশাব পরীক্ষা করা, এক্স-রে — এর মাঝে সন্দেহ করার কি আছে? কে জানে, আসলেই নাওয়াজ খান মানুষটা হয়তো ফিরিশতার মত। মানুষের উপকার করতে চান, গরিব বাচ্চাদের সাহায্য করতে চান। বাবাকে দেখে আমার মনে হয় মন বিষিয়ে গেছে, সব মানুষকেই শুধু সন্দেহ করি।

জয়নাল মুখ কাচুমাচু করে বলল, আপনি কাউকে বলবেন না তো?

না।

খোদার কসম?

খোদার কসম।

জয়নালের মুখটা আবার তখন হাসি হাসি হয়ে গেল। পিচিক করে একবার থুতু ফেলে বলল, নাওয়াজ খান সাহেব বলেছেন, জানাজানি হয়ে গেলে আর এক পয়সাও দিবেন না।

ভয় পাস না। জানাজানি হবে না।

আমি জয়নালের মানি অর্ডার ফরম লিখে তার চিঠিটাও লিখে দিলাম। চিঠি লিখে লিখে তার ভাইবোন সবার নাম, কে কি করে, সবকিছু আমার জানা হয়ে গেছে। বাবা নেই, বড় ভাই একটা অপদার্থ, টাকাপয়সা নষ্ট করে। বার বার চিঠিতে তার মাকে সেটা সাবধান করে দেয়। ছোট একটা বোন, রওশন, স্কুলে যায়, খুব পড়াশোনার শখ। রওশনের জন্যে তার খুব মায়া। সে যেন স্কুলে যায়, পড়াশোনা করে, সেটা বারবার করে লিখতে থাকে। যেহেতু সে নিজে লেখাপড়া জানে না, তার চিঠি লিখে দেয়া খুব শক্ত ব্যাপার। একটা কথাই সে বারবার বলতে থাকে। কথায় গুরুত্ব দেয়ার জন্যে মুখে একটা কথা কয়েকবার বলা যায়। কিন্তু চিঠিতে একটা কথা কয়েকবার আবার কেমন করে লিখে? কিন্তু জয়নালের চিঠিতে সেটাই করতে হয়। তাকে বুঝিয়েও কোন লাভ হয় না। আজকে এক জায়গায় লিখতে হল—

. . . রওশনের দিকে বিশেষ নজর দিবেন। বিশেষ নজর দিবেন। স্কুলে যেন সময়মত যায়। পড়ালেখা যেন করে। সেই জন্য বিশেষ নজর দিবেন। পড়ালেখায় নজর দিবেন। স্কুলে যেন যায়। সেই দিকে বিশেষ নজর দিবেন। বইপুস্তক লাগিলে কিনিয়া দিবেন। টাকা পাঠাইলাম। বইপত্র কিনিবেন। বিশেষ নজর দিবেন . . .

আমি আজকাল আর আপত্তি করি না, যাই বলে তাই লিখে দিই। চিঠি লেখা শেষ হলে তাকে পড়ে শোনাতে হয়। সে তখন খুব গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলে, মনির ভাই, আপনি খুব ভাল চিঠি লিখেন। একেবারে ফাস কেলাশ।

৫. গাছঘর

অংক ক্লাসে সলীল ফিসফিস করে বলল, একটা ঝামেলা হয়ে গেছে।

আমিও ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, কি ঝামেলা?

মনে আছে সেই বইটা?

কোন্ বইটা?

নীল নয়নার অভিসার। তোকে দেখিয়েছিলাম?

আমার মনে পড়ল, বাবা বাসায় ছিলেন বলে বইটা পড়তে নিতে পারিনি। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে সেই বইটার?

খুঁজে পাচ্ছি না।

খুঁজে পাচ্ছিস না?

না।

সর্বনাশ।

হ্যাঁ। কাল ফেরৎ দিতে হবে। সলীল শুকনো মুখে বলল, না হয় সঞ্জয়দা আমাকে ধরে একেবারে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। লাইব্রেরি থেকে এনেছিল।

কোথায় হারিয়েছিস?

জানি না। সব জায়গায় খুঁজে ফেলেছি। কোথাও নাই। আমার কি মনে হয় জানিস?

কি?

জারুল চৌধুরীর বাসায় ফেলে এসেছি।

আমি চোখ বড় বড় করে তাকালাম, জারুল চৌধুরী?

হ্যাঁ। সলীল মুখ কাচুমাচু করে আমার দিকে তাকাল, কিছু বলল না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন তোর জারুল চৌধুরীর বাসায় যেতে হবে?

সলীল মাথা নাড়ল। তাপর মুখ আরো কাচুমাচু করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, তুই চাস আমি তোর সাথে যাই?

সলীল জোরে জোরে মাথা নাড়ল।

কখন যেতে চাস?

সময় নাই। টিফিন ছুটির সময় যেতে হবে।

ক্লাস ফাঁকি দিয়ে?

সলীল আবার এমনভাবে মুখ কাচুমাচু করে তাকাল যে আমি আর না করতে পারলাম না।

টিফিন ছুটির সময় আমি আর সলীল আলাদা আলাদাভাবে ক্লাস থেকে সাবধানে বের হয়ে এলাম। ক্লাসে এত ছেলে, আমাদের কেউ যদি খোজ না করে, ধরা পড়ার কোন ভয় নেই। সাবাইকে জানিয়ে শুনিয়ে হৈ চৈ করে কখনো ক্লাস থেকে পালানো যায় না, কিন্তু গোপনে, কাউকে না জানিয়ে সটকে পড়া এমন কিছু কঠিন ব্যাপার না। তাছাড়া আমি তো আর স্কুল ফাঁকি দেওয়ার জন্যে যাচ্ছি না, যাচ্ছি বন্ধুকে বিপদে সাহায্য করার জন্যে। একজন পাগল মানুষের বাসায় তো আর সলীলকে একা যেতে দিতে পারি না। হঠাৎ যদি রাম দা হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জারুল চৌধুরী? কেটে যদি পুঁতে ফেলে? দুইজন থাকলে তবু কিছু একটা করা যাবে, একা থাকলে কোন উপায়ই নেই।

হেঁটে হেঁটে যাবার সময় যখন সুতরাপুরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি তখন রাস্তার পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় দোতলা সাদা একটা দালান চোখে পড়ল। গেটের উপর একটা

বড় বোর্ডে লেখা, "গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিক"। এটাই নিশ্চয়ই জয়নালের সেই ক্লিনিক, যেখানে গরিব বাচ্চাদের নানারকম পরীক্ষা করে টাকাপয়সা দেয়। আমি যেতে যেতে ক্লিনিকটাকে ভাল করে দেখলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চকচকে দোতলা একটা দালান। জায়গাটা অবিশ্যি একটু বেশি নিরিবিলি। দেয়াল দিয়ে ঘেরা বড় একটা জায়গা, ভিতরে নানা রকম গাছপালা। ক্লিনিকটা দেখে মনে হয় নির্জন, ভিতরে কোন রোগী আছে বলে মনে হয় না। কোন রকম রোগী না পেলে এই ক্লিনিক কেমন করে চলবে কে জানে!

সলীল আমাকে জিজ্ঞেস করল, কি দেখছিস?

না কিছু না — বলেও আমি ঘাড় ঘুরিয়ে গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিকটাকে দেখতে থাকি। দোতলায় মনে হল একটা বাচ্চা ছেলে হেঁটে যাচ্ছে, সাথে পরিষ্কার কাপড় পরা একজন মানুষ। কে জানে, এই মানুষটাই হয়তো ডাক্তার নাওয়াজ খান। জয়নালের ভাষায় ফিরিশতার কিসিমের মানুষ।

সলীল আবার জিজ্ঞেস করল, কি দেখছিস?

নাহ্ কিছু না। বলেও আমি সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিছু না মানে? সলীল একটু রেগে বলল, সেই তখন থেকে ঘাড় বাঁকা করে দেখছিস, আর বলছিস কিছু না।

না, মানে, বলা নিষেধ।

কি বলা নিষেধ?

একটা জিনিস যদি বলা নিষেধ হয় সেটা কেমন করে বলি? যদি বলা হয় সেটা কি নিষেধ মানা হল?

সলীল কি রকম জানি কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে তাকাল, তারপর বলল, আমাকে বললে ক্ষতি কি? আমি কি কাউকে বলে দেব? কখনো দিই?

আমার নিজেরও জয়নালের কথাটা বলার জন্যে মুখটা সুড়সুড় করছিল, তাই শেষ পর্যন্ত সলীলকে বলে দেয়াই ঠিক করলাম। বললাম, ঠিক আছে, তোকে বলতে পারি। তুই কাউকে বলবি না তো?

না।

খোদার কসম?

খোদার কসম। ভগবানের কীরা।

আমি তখন সলীলকে জয়নালের কথাটা খুলে বললাম। কেমন করে সে গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিকে যায় এবং কেমন করে ডাক্তার নাওয়াজ খান তাকে টিপে টুপে পরীক্ষা করে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করেন। সব শুনে সলীল একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে বলল, সত্যি? সত্যি?

সত্যি। আমি নিজে জয়নালের মানি অর্ডার ফরম ফিলআপ করে দিয়েছি। আমি জানি। তোর কি মনে হয় সলীল, নাওয়াজ খান মানুষটার কি কোন বদ মতলব আছে?

বদ মতলব? সলীল চোখ কপালে তুলে বলল, বদ মতলব কেন থাকবে? একজন

দেবতার মত মানুষ, গরীব বাচ্চাদের সাহায্য করছে, আর তুই বলছিস বদ মতলব?

খামাখা কি আর কেউ কাউকে সাহায্য করে? খোঁজ নিয়ে দেখ্, নিশ্চয়ই কোন না কোন বদ মতলব —

সলীল রেগে গিয়ে বলল, তোর মনটাই প্যাঁচালো। কোন ভাল জিনিস দেখিস না। পৃথিবীতে যত জন খারাপ মানুষ তার থেকে অনেক বেশি ভাল মানুষ, সেটা জানিস?

আমি মাথা নাড়লাম, জানি না।

তাহলে জেনে রাখ। গাধা কোথাকার।

আমি আর তর্ক করে কথা বাড়ালাম না। সত্যিই যদি পৃথিবীতে ভাল মানুষ বেশি থাকে, ব্যাপারটা খারাপ হয় না। কিন্তু আমার সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে।

সলীল হেঁটে যেতে যেতে বলল, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।

কি আইডিয়া?

মনে আছে পারভেজ স্যার যে একটি রচনা লিখতে দিয়েছেন?

আমি মাথা নাড়লাম, মনে আছে। পারভেজ স্যার একজন কমবয়সী স্যার, নতুন এসেছেন, সব ব্যাপারে খুব উৎসাহ। আমাদের নানারকম বিচিত্র জিনিস নিয়ে রচনা লিখতে দেন। গত সপ্তাহে রচনার বিষয়বস্তু ছিল "আমি যদি পোকা হতাম", এর আগের সপ্তাহে ছিল "নিউটনের যদি একটা কম্পিউটার থাকত"! খুব মজার বিষয়বস্তু, লিখতে গিয়ে আমাদের এমন সব ব্যাপার চিন্তা করতে হয় যেটা আগে কোনদিন চিন্তা করিনি। সেই তুলনায় এই সপ্তাহের বিষয়টি অনেক সোজা — "আমার দেখা একজন খাটি মানুষ।" আমি কাকে নিয়ে লিখব সেটা এখনো ঠিক করিনি। সলীল মনে হয় ঠিক করে ফেলেছে। জিজ্ঞেস করলাম, কাকে নিয়ে লিখবি।

নাওয়াজ খান।

কিন্তু তুই তো তাকে এখনো চিনিস না। তোকে লিখতে হবে এমন একজন মানুষকে নিয়ে যাকে তুই চিনিস।

সেটাই তো আইডিয়া। কাল পরশু কোন একদিন গিয়ে নাওয়াজ খানের সাথে পরিচয় করে আসব —

না — আমি জোরে মাথা নেড়ে বললাম, তুই কথা দিয়েছিস জয়নালের কথা কাউকে বলবি না, তুই কিছুতেই যেতে পারবি না। কিছুতেই না।

আমি জয়নালের কথা বলব না, একটা কথাও বলব না। এই বুক ছুঁয়ে বলছি।

তাহলে কি বলবি?

কিছু বলব না। শুধু জিজ্ঞেস করব দেশের উপকার করার জন্যে কি করা যায় সেটা নিয়ে কি ভাবেন? তখন নিজে থেকেই হয়তো বলবেন।

আর যদি না বলেন?

না বললে নাই, তাহলে অন্য কাউকে নিয়ে লিখতে হবে।

ব্যাপারটা আমার ঠিক পছন্দ হল না, কিন্তু সেটা নিয়ে ঠিক কি করা যায় বুঝতে

পারলাম না।

জারুল চৌধুরীর বাসায় গিয়ে তাকে খুঁজে পেলাম না। নিচে নেই, উপরে নেই, ভয়ে ভয়ে ঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখি, দরজা খোলা, ঘরের ভিতরে কেউ নেই। যখন চলে আসছিলাম তখন শুনি, কোথা থেকে জানি ঠকঠক করে শব্দ হচ্ছে। শব্দ যেদিক থেকে আসছে সেদিকে গিয়েও কিছু খুঁজে পেলাম না। যখন চলে আসছিলাম, হঠাৎ শুনি জারুল চৌধুরীর গলা, চিৎকার করে ডাকছেন, এই যে সলীল! মুনীর!

আমরা এদিক সেদিক তাকিয়ে তাঁকে খুঁজে পেলাম না। কোথা থেকে বলছেন?

এই যে আমি এখানে। উপরে।

আমি আর সলীল অবাক হয়ে উপরের দিকে তাকালাম, দেখি, দূরে বিশাল একটা গাছের ডাল পাতার ফাঁক থেকে জারুল চৌধুরী আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন। আমি আর সলীল এগিয়ে গেলাম, কাছে গিয়ে দেখি, গাছের মোটামোটা তিনটা ডালের মাঝখানে একটা ছোট ঘর তৈরি করা হচ্ছে। ঘরটি এখনো শেষ হয়নি, দু পাশের দেয়াল আর উপরের ছাদ এখনো বাকি। কিন্তু এটা যে একটা ঘর তাতে কোন সন্দেহ নেই। জারুল চৌধুরীর মাথায় লাল গামছাটি বাঁধা, হাতে একটা হাতুড়ি, সেটা দিয়ে নিশ্চয়ই কোথাও পেরেক ঠুকছিলেন। আমরা বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম। বইপত্রে কোথাও কোথাও দেখেছি মানুষ গাছের উপর ঘর তৈরি করে, তাই বলে সত্যি সত্যি?

সলীল ফিসফিস করে বলল, হুবহু সুইস ফেমিলি রবিন্সন! মনে আছে?

আমি মাথা নাড়লাম, জারুল চৌধুরী গাছের উপর থেকে বললেন, তারপর মানিকজোড়, কি মনে করে?

সলীল তখনো কথা বলতে পারছিল না, কোন মতে একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে চাপা গলায় বলল, কি সুন্দর! আহা কি সুন্দর!

জারুল চৌধুরী হো হো করে হেসে বললেন, উপরে আসবে?

আমরা দুজন জোরে জোরে মাথা নাড়লাম। আগে ধারণা ছিল মানুষটি পাগল, কিন্তু যে গাছের উপর এত সুন্দর ঘর তৈরি করতে পারে সে আর যাই হোক পাগল না। আর যদি পাগল হয়েই থাকে তাহলে পৃথিবীতে এরকম পাগলেরই দরকার।

আমরা ডাল বেয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, জারুল চৌধুরী মাথা নেড়ে বললেন, দাঁড়াও, দড়ির মইটা নামিয়ে দিই।

জারুল চৌধুরী উপর থেকে একটা দড়ির মই নামিয়ে দিলেন। দুটি মোটা দড়ির মাঝখানে বাঁশের শক্ত কঞ্চি বেঁধে মই তৈরি করা হয়েছে। এত চমৎকার যে আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মই দিয়ে প্রথমে আমি, আমার পিছনে সলীল উঠে এল। উপরে খোলামেলা একটা ঘর তৈরি হচ্ছে, শক্ত কাঠের মেঝে, চারপাশে দেয়াল। একদিকে একটা জানালা, ছাদ তৈরি করার জন্যে কাঠ পাতা হয়েছে, ঢেকে দেয়া

বাকি।

জারুল চৌধুরী চশমার ওপর দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বললেন, কি মনে হয় তোমাদের? আমার নতুন বাসা—

আপনার বাসা? আপনি এখানে থাকবেন?

হুম! জারুল চৌধুরী এক ধরনের রহস্যের মত ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বললেন, যখন ছোট ছিলাম তখন খুব শখ ছিল গাছের উপর একটা ঘর তৈরি করব। ছেলেবেলায় আর তৈরি করতে পারিনি। এখন এত সময়, ভাবলাম গাছের উপর ঘর একটা তৈরি করে ফেলি। পরে আফসোস রয়ে যাবে, তাহলে মরে আবার ভূত হয়ে ফিরে আসতে হবে। কি, ভাল হচ্ছে না?

আমরা এত মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম যে, একেবারে কোন কথাই বলতে পারছিলাম না।

জারুল চৌধুরী হাত দিয়ে দেখালেন, এই যে এখানে হবে আরেকটা জানালা। আর এই যে ছাদ। দড়ির একটা বিছানা থাকবে, শুয়ে শুয়ে বই পড়ব। রাত্রে ঘুমাতে চাইলে স্লিপিং ব্যাগ।

স্লিপিং ব্যাগ?

হ্যাঁ, স্লিপিং ব্যাগ জান তো কি?

সলীল মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, জানি। বইয়ে পড়েছি। ব্যাগের মত থাকে, ভিতরে ঘুমায়। ঠাণ্ডা লাগে না।

হ্যাঁ, আর এখানে একটা ছোট শেলফের মত হবে, সেখানে বইপত্র, শুকনো খাবার।

আমরা হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, জারুল চৌধুরীর ডান হাতের তালুতে একটা ব্যাণ্ডেজ, মনে হয় কোনভাবে কেটে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার হাতে কি হয়েছে?

জারুল চৌধুরী কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেলেন, মাথা নেড়ে বললেন, আর বল না, গত সপ্তাহে একটা ঢাউস ঘুড়ি তৈরি করে উড়াচ্ছি। সুতায় মাঞ্জা দিয়েছি আচ্ছা মত, সুতা তো নয়, একেবারে ধারালো চাকু! বেশ ভালই উড়ছিল, চারটা ঘুড়ি কেটে দিলাম, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই গোত্তা খেল নিচের দিকে, প্রথমে সুতাটা একটু ঢিল দিয়ে যেই ছেড়েছি হঠাৎ সাঁই সাঁই করে উঠতে লাগল, হাত দিয়ে ধরতে গেলাম, মাঞ্জা দেয়া সুতায় হাত কেটে একেবারে রক্তারক্তি!

সলীল বলল, ইশ!

বুড়ো মানুষদের বাচ্চা হওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। যখন বাচ্চা ছিলাম তখন কাজগুলি কি সহজ ছিল, এখন যতই দিন যাচ্ছে ততই কঠিন হয়ে যাচ্ছে!

জারুল চৌধুরী খানিকক্ষণ নিজের ব্যাণ্ডেজ করা হাতটি দেখে বললেন, তারপর তোমরা মানিকজোড়, কি মনে করে? স্কুল পালিয়ে?

সলীল তার বইয়ের কথা বলতে যাচ্ছিল, জারুল চৌধুরী হাত তুলে থামিয়ে দিলেন। বললেন, বুঝেছি। নীল নয়নার অভিসার। তাই না?

আমরা মাথা নাড়লাম, মনে হল এখন বুঝি আমাদের ধমকে দেবেন এরকম একটা বই পড়ার জন্যে, কিন্তু ধমকে দিলেন না বরং হাসি হাসি মুখে বললেন, অনেকদিন এরকম একটা বই পড়িনি, তাই সেদিন বসে বসে পড়ে ফেললাম।

সলীল কোন কথা বলল না, জারুল চৌধুরী মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, কাহিনীটা জানি কি রকম! নীল নয়না চাকু দিয়ে তার ভালবাসার মানুষের বুক কেটে ফেলল, তারপর রক্তে হাত ভিজিয়ে বলল, যেও না যেও না ওগো—সেটা কি কখনো হয়?

সলীল দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল, কয়েকদিন আগেই সে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল কি দারুণ এই বইটা, কি চমৎকার তার ভাষা, কি সাংঘাতিক তার কাহিনী! কিন্তু এখন জারুল চৌধুরীর সামনে সে একেবারে চুপ মেরে রইল, একবারও প্রতিবাদ করল না।

জারুল চৌধুরী মনে হল বইয়ের কাহিনীটার কথা চিন্তা করে একবার একটু শিউরে উঠলেন, তারপর বললেন, যাবার সময় নিয়ে যেও বইটা।

ঠিক আছে।

আমরা সেই গাছঘরে পা ঝুলিয়ে বসে রইলাম। জারুল চৌধুরী তার লাল গামছায় চশমা পরিষ্কার করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কয়দিনেই জায়গাটার উপর মায়া পড়ে গেছে।

হ্যাঁ, এত সুন্দর গাছপালা! নিরিবিলি।

ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে।

আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ছেড়ে যাবেন?

হ্যাঁ। যেতে তো হবেই এক সময়ে।

তাহলে এত সুন্দর করে এই যে ঘর তৈরি করলেন?

শখ হয়েছে, তাই তৈরি করছি। এক সময়ে ছেড়ে যেতে হবে। সংসারে কিছু কি রাখা যায়? সব ছেড়ে যেতে হয়।

শুনে আমাদের একটু মন খারাপ হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাবেন আপনি?

ঢাকা। এ জায়গাটা আসলে বিক্রি করে দিচ্ছি। কেউ থাকে না, কোন কাজে আসে না।

সলীল আস্তে আস্তে বলল, সব কিছু কি কাজে আসতে হয়?

জারুল চৌধুরী কেমন যেন অবাক হয়ে সলীলের দিকে তাকালেন, তারপর আবার চশমা খুলে মনোযোগ দিয়ে তার লাল গামছা দিয়ে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে লাগলেন।

সলীল জিজ্ঞেস করল, যে জায়গাটা কিনছে সে কি করবে এখানে?

ইটের ভাটা তৈরি করবে।

ইটের ভাটা? আমি আর সলীল প্রায় চিৎকার করে বললাম, ইটের ভাটা?

হ্যাঁ। কাছেই নদী, নৌকায় ইট আনা নেয়া করা খুব সহজ হবে। জঙ্গলে গাছপালা আছে, কেটে লাকড়ি তৈরি করা হবে।

লাকড়ি?

জারুল চৌধুরী কেমন যেন অপরাধীর মত মুখ করে আমাদের দিকে তাকালেন। আমি মাথা নেড়ে বললাম, এটা যদি আমার জায়গা হত তাহলে কখনো এই জায়গা আমি বিক্রি করতাম না। কখনো না।

সলীলও আস্তে আস্তে বলল, আমিও করতাম না।

জারুল চৌধুরী কেমন যেন কাচুমাচু করে বসে রইলেন, দেখে মনে হল, তাঁর কেমন জানি মন খারাপ হয়ে গেছে। মনে হল কিছু একটা চিন্তা করছেন। সলীল আবার বলল, আপনি চিন্তা করতে পারেন, এই সুন্দর জায়গাটা একটা ইটের ভাটা হয়ে যাবে? সব গাছ কেটে ফেলবে, শুকনো ধু ধু চারিদিকে, মাঝখানে ইটের ভাটা। সেখান থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। কাল কুচকুচে ধোঁয়া—

জারুল চৌধুরী মনে হল আরো দমে গেলেন। খানিকক্ষণ পা ঝুলিয়ে বসে থেকে বললেন, তোমরা মনে হয় ঠিকই বলেছ। কিন্তু মুশকিলটা কি জান?

কি?

বড় হয়ে গেছি। যেটা করতে চাই সেটা আর করতে পারি না। কি করি জান? যেটা করা দরকার সেটা।

আমরা তিনজনই মন খারাপ করে একটা বড় গাছের উপর থেকে পা ঝুলিয়ে বসে রইলাম।

৬. নাওয়াজ খান

গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিকের সামনে এসে আমি আর সলীল দুজনেই দাঁড়িয়ে গেলাম। সলীল এতক্ষণ বেশ বড় বড় কথা বলছিল, কেমন করে নাওয়াজ খানের সাথে দেশের উন্নতি নিয়ে কথা বলবে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট কেমন করে দূর করা যায় সেসব আলোচনা করবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার উৎসাহ কেমন যেন মিইয়ে গেল। আমি বললাম, চল ফিরে যাই। খামাখা গিয়ে কি হবে? বড় মানুষ, উল্টো একটা ধমক দিয়ে বের করে দেবে।

কেন ধমক দিয়ে বের করে দেবে?

বড় মানুষদের আক্কেল কম হয়, সেজন্য।

সলীল আমার দিকে চোখ পালিয়ে তাকিয়ে বলল, তোর ধারণা বড় মানুষ মাত্রই

খারাপ, সেটা ঠিক না। পৃথিবীতে অনেক ভাল বড় মানুষ আছে। যদি একজন ভাল মানুষ থাকে তার দেখাদেখি আরো অনেক ভাল মানুষ বের হয়।

কচু হয়।

সলীল রেগে বলল, ধরে একটা থাবড়া দেব। কবি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন তৈরি করেছিলেন, কত বড় বড় মানুষ যেখান থেকে বের হয়েছে জানিস?

আমি সলীলকে রাগানোর জন্যে হি হি করে হেসে বললাম, তুই ভাবছিলি নাওয়াজ খানকে নিয়ে আরেকটা শান্তিনিকেতন তৈরি করবি?

সলীল কিছু না বলে আমার দিকে চোখ লাল করে তাকিয়ে গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিকের সামনে দুইবার সামনে পিছনে হাঁটল। তারপর আমার মুখের কাছে আঙুল তুলে বলল, তোর যা ইচ্ছা হয় কর, আমি ভিতরে গেলাম।

তারপর আমি কিছু বলার আগে সত্যি সত্যি গেট খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। আমি একা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি কেমন করে, তাই সলীলের পিছনে পিছনে আমিও ঢুকে গেলাম। গেটের পিছনে রাস্তায় একটা সাদা রঙের মাইক্রোবাস। একজন মানুষ লাল রঙের একটা কাপড় দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে গাড়িটা মুছে পরিষ্কার করছে। মনে হয় মানুষটা ডাক্তার নাওয়াজ খানের ড্রাইভার। মানুষটা আমাদের দেখে ভুরু কুঁচকে খামাখাই গলা উঁচিয়ে বলল, কি চাও?

সলীল কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, আমরা ডক্টর নাওয়াজ খানের সাথে দেখা করতে এসেছি।

লোকটা এক পা এগিয়ে এসে বলল, কেন?

তাঁর সাথে একটু কাজ ছিল।

কি কাজ? চাঁদা চাইতে এসেছ? ডাক্তার সাহেব কোন চাঁদা-ফাঁদা দেন না।

না, চাঁদা না। তাঁর সাথে একটু কথা বলতে চাই।

কি কথা?

সলীল মনে হয় তখন একটু রেগে গেল। বলল, সেটা আমি নাওয়াজ খান সাহেবকে বলব।

সলীলের কথা শুনে ড্রাইভার মানুষটাও মনে হল রেগে গেল। বলল, ডাক্তার সাহেব ব্যস্ত মানুষ, তোমাদের সাথে খোশগল্প করার সময় নাই। যাও, বাড়ি যাও।

সলীলও খুব রেগে গেল, কিন্তু তবু সে গলার স্বর ঠাণ্ডা রেখে বলল, আপনি কে? আপনার কথায় কেন আমরা যাব? আমরা ডক্টর নাওয়াজ খানের সাথে কথা বলতে এসেছি, তাঁর সাথে কথা না বলে যাব না।

ড্রাইভার মানুষটা এবারে রেগে আগুন হয়ে কিছু একটা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ দোতলা থেকে একটা মানুষের গলা শুনতে পেলাম, ওসমান!

আমরা উপরে তাকালাম, দোতলার বারান্দায় ফর্সা লম্বা একজন সুন্দর মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই ডাক্তার নাওয়াজ খান। সেখান থেকেই আবার বলল, কি

হয়েছে ওসমান?

ওসমান নামের মানুষটা একটু থতমত খেয়ে বলল, এই দুজন ছেলে আপনার সাথে দেখা করতে চায়।

কেন?

আমাকে বলবে না।

ঠিক আছে। উপরে পাঠিয়ে দাও।

সলীল আর আমি ওসমানের দিকে বিজয়ীর মত তাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। মানুষটা খুব রেগেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ উপরে উঠতে উঠতে আমরা দেখলাম, ওসমান মাইক্রোবাসের টায়ারে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি মেরে বসল।

ওপরে সিঁড়ির পাশে একটা ছোট ঘর, ডাক্তারের চেম্বারের মত। একটা বড় টেবিল, পিছনে শেলফ, শেলফে ডাক্তারী বইপত্র। টেবিলের এক পাশে একটা চেয়ারে নাওয়াজ খান বসে আছেন। আমাদের ঢুকতে দেখে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমার সাথে দেখা করতে এসেছ?

সলীল আর আমি এক সাথে মাথা নাড়লাম। নাওয়াজ খানের গলার স্বর গুরু গম্ভীর, শুনে কেমন যেন ভয় লেগে যায়।

কি ব্যাপার?

সলীল কেশে একটু গলা পরিষ্কার করে বলল, আমার নাম সলীল। আর এই হচ্ছে মুনীর।

ও।

আমরা গভমেন্ট স্কুলে পড়ি।

বেশ।

আমরা আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি কয়েকটা প্রশ্ন করার জন্যে।

কি প্রশ্ন?

সলীল হঠাৎ একটু ঘাবড়ে গেল। নাওয়াজ খানের গলা রীতিমত কঠিন, এরকম মানুষের সাথে স্বাভাবিক কথাবার্তাই চালানো যায় না, তাকে কঠিন কঠিন প্রশ্ন করা তো এক রকম অসম্ভব। সলীল তবু চেষ্টা করল, মাথা চুলকে গলা খাকারী দিয়ে ঠিক কিভাবে শুরু করবে বুঝতে না পেরে আমতা আমতা করে বলল, দেশের মানুষের উন্নতির জন্যে আমাদের কি করা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন?

নাওয়াজ খান কোন কথা না বলে সরু চোখে সলীলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁকে দেখে মনে হতে লাগল তিনি কেমন যেন রেগে উঠছেন। আমাদের হঠাৎ কেমন জানি ভয় করতে থাকে, সলীল আরো একটা কি বলতে গিয়ে হঠাৎ থতমত খেয়ে থেমে যায়। নাওয়াজ খান থমথমে গলায় বললেন, তুমি এটা জিজ্ঞেস করার জন্যে আমার সাথে দেখা করতে এসেছ?

সলীল দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল।

নাওয়াজ খান মুখ বাঁকা করে টিটকিরি করার মত ভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?

কি প্রশ্ন?

এত মানুষ থাকতে তোমরা আমার কাছে এসেছ কেন? তোমাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি?

সলীল আমতা আমতা করে বলল, আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আমাদের এটা তো ছোট শহর, বড় মানুষজন বেশি নাই। বড় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর নাই। আপনি যখন এখানে এসে এত বড় মেডিকেল ক্লিনিক খুলেছেন আপনার নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে—

নাওয়াজ খান টেবিলের উপর ঝুঁকে প্রায় বাঘের মত গর্জন করে বললেন, আমার উদ্দেশ্য আছে?

সলীল দুই হাত উপরে তুলে বলল, না না না, খারাপ উদ্দেশ্য না। ভাল উদ্দেশ্য। নিশ্চয়ই ভাল উদ্দেশ্য।

নাওয়াজ খান কোন কথা না বলে আমাদের দিকে চোখ ছোট করে তাকিয়ে রইলেন। সলীলের কথাবার্তা খুব যে ভাল এগুচ্ছে না তাতে কোন সন্দেহ নেই, সেটা ভাল এগুবে তার কোন সম্ভাবনাও নেই। আমি এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম, এবারে চিঁ চিঁ করে বললাম, আপনি যদি খুব ব্যস্ত থাকেন তাহলে আমরা এখন যাই। অন্য কোনদিন না হয় আসব।

নাওয়াজ খান ধমক দিয়ে বললেন, সত্যি করে বল কেন এসেছ?

খোদার কসম, আমি বুকে হাত দিয়ে বললাম, আমরা এমনি এসেছি।

তোমরা যে এখানে এসেছ তার পিছনে আর কোন কারণ নেই?

জী না, নেই।

সলীলও জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, না স্যার, কোন কারণ নেই। আমাদের স্কুলে এটা নিয়ে একটা রচনা লিখতে হবে, তাই ভাবলাম, যারা বড় মানুষ, দায়িত্বশীল মানুষ, তাদের সাথে কথা বলে দেখি। আমরা ছোট বলে কেউ বেশি পাত্তা দিতে চায় না, তাই ভাবলাম—

কি ভাবলে?

আপনার সাথে কথা বলে দেখি।

আগে আরো চেষ্টা করেছ?

করেছি। কেউ পাত্তা দেয় নাই। সলীল অত্যন্ত সরল মুখ করে মিথ্যা বলতে থাকে, কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে গিয়েছি, চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে গিয়েছি। আরো দুইজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছি।

নাওয়াজ খান মনে হল শেষ পর্যন্ত একটু নরম হলেন। বললেন, ঠিক আছে, বস।

আমরা দুইজন খুব সাবধানে একটা নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে কাছাকাছি দুইটা চেয়ারে বসলাম। নিজেদেরকে মনে হচ্ছে ফাঁসির আসামী, যেন এক্ষুনি ফাঁসির রায় দেয়া হবে।

নাওয়াজ খান চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বললেন, তোমাদের প্রশ্নটা যেন কি?

দেশের উন্নতির জন্যে আমাদের কি করা উচিৎ?

প্রত্যেকটা মানুষ যদি নিজের উন্নতি করে তাহলেই দেশের উন্নতি হবে।

কিন্তু, কিন্তু —

কিন্তু কি?

একজন যদি খুব গরিব হয়, পড়াশোনা করতে না পারে, কোন সুযোগ না পায়, তাহলে সে নিজের উন্নতি কেমন করে করবে?

সেরকম মানুষের কথা ভুলে যাও।

ভুলে যাব?

হ্যাঁ। তারা সমাজের বোঝা। দেশের বোঝা।

বোঝা?

হ্যাঁ। সেরকম মানুষ যত কম হয় তত মঙ্গল।

কিন্তু —

নাওয়াজ খান জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মত বললেন, পৃথিবীটা হচ্ছে একটা বিরাট ফুড চেইন। একদল আরেক দলকে খাচ্ছে। খেয়ে বেঁচে আছে। যার কপাল ভাল সে ফুড চেইনের উপরে, যার খারাপ সে নিচে। চেষ্টা করতে হয় ফুড চেইনের উপরে থাকতে যেন তোমাকে কেউ খেতে না পারে, কিন্তু তুমি অন্যকে খেতে পার।

নাওয়াজ খান কি বলতে চাইছেন আমি আর সলীল ঠিক বুঝতে না পেরে একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। নাওয়াজ খান জানালার বাইরে থেকে মুখ ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, যারা গরিব, অশিক্ষিত, মূর্খ মানুষ তারা দুর্বল মানুষ। তারা ফুড চেইনের নিচে। তারা কোন কাজে আসে না। যদি কোনভাবে তাদের ব্যবহার করা যায়, ভাল। করা না গেলে নেই। তাদের নিয়ে মাথা ঘামালে দেশের কোন উন্নতি হবে না। দেশের উন্নতি করবে সমাজের যারা এলিট গ্রুপ, তারা। যারা জ্ঞানে-গুণে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে তুখোড়, তারা। চেষ্টা কর সেরকম মানুষ হতে—

সলীল প্রতিবাদ করে আরো কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, এই মানুষটার সাথে কথা বলে কোন লাভ নেই। নাওয়াজ খান আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আর কোন প্রশ্ন আছে?

আমরা মাথা নাড়লাম, না নেই।

যাও, তাহলে বাড়ি যাও।

গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিক থেকে হেঁটে আসতে আসতে সলীল বলল, নাওয়াজ খান মানুষটা অনেক ডেঞ্জারাস।

আমি বলেছিলাম না তোকে?

চোখের দিকে তাকালে কেমন যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।

আমি আবার বললাম, তোকে বলেছিলাম না আগেই?

তোর জয়নালের মনে হয় অনেক বড় বিপদ হতে পারে। বলিস এই লোক থেকে দূরে থাকতে। একশ হাত দূরে থাকতে।

পারভেজ স্যারের রচনা লিখতে আমাদের একটু ঝামেলা হল। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আমি লিখলাম বৃন্দাবনের উপর, যে উকিল সাহেবের গরুর দুধ দোয়াতে আসে। থুরথুরে বুড়ো কিন্তু এই বয়সে সে রাস্তার একটা বাচ্চাকে নিজের বাচ্চার মত করে বড় করেছে। সব সময় তার পিছনে পিছনে ঘুরে। সলীল লিখল একজন রিকশাওয়ালার উপরে, ভুল করে একবার রিকশায় একটা ব্যাগ ফেলে রেখে এসেছিল, রিকশাওয়ালা খুঁজে এসে ফেরৎ দিয়ে গেছে। ব্যাগে বেশ কিছু টাকা ছিল কিন্তু সে খুলেও দেখেনি!

৭. আহসান এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

ইতিহাস ক্লাসে সুনির্মল দপ্তরী একটা ছোট চিরকুট নিয়ে এল। ইতিহাস স্যার চিরকুটটা পড়ে ভুরু কুঁচকে ক্লাসের দিকে তাকালেন, তারপর মেঘ স্বরে বললেন, মুনীর আর সলীল—

আমি আর সলীল উঠে দাঁড়ালাম।

তোমাদের দুজনকে হেডস্যার ডেকে পাঠিয়েছেন।

শুনে আমাদের একেবারে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। হেডস্যার ডেকে পাঠানো এখন পর্যন্ত কারো জন্যে কোন সুসংবাদ বয়ে আনেনি। এক কথায় বলা যায়, এটা সাক্ষাৎ মৃত্যুর আলামত। কি জন্যে আমাদের উপর এই মহা বিপর্যয় নেমে আসছে সেটাই প্রশ্ন। সেদিনের স্কুল পালানোটা কি হেডস্যার জেনে গেছেন? কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব? অন্য কেউ তো টের পায়নি। তাহলে কি বড়দের উপন্যাস পড়াটা? কিন্তু সেটাও তো খুব বেশি মানুষ জানে না। নাওয়াজ খানের চেম্বারে গিয়ে আমরা কি কিছু গোলমাল করে এসেছি? নাকি অন্য কিছু? গত কয়েক সপ্তাহে আমি যত অপকর্ম করে এসেছি সবগুলি একে একে মনে পড়তে লাগল।

ইতিহাস স্যারের কোন দয়া মায়া নেই বলে ধরে নেয়া হয়। ক্লাসে আবার সেটা

প্রমাণ হল, স্যার মধুর ভঙ্গিতে হেসে বললেন, যাও বাবারা, একটু ধোলাই খেয়ে আস।

আমি আর সলীল ফ্যাকাসে মুখে সুনির্মল দপ্তরীর সাথে রওনা দিলাম। সলীল গলা নামিয়ে বলল, সুনির্মলদা, ব্যাপারটা কি?

সুনির্মলদা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে উদাস গলায় বললেন, আর ব্যাপার!

শুনে আমরা আরো ঘাবড়ে গেলাম।

হেডস্যারের রুমে গিয়ে পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখি, ভিতরে দুইজন মানুষ বসে আছে। দুজনেই মোটা এবং ফর্সা। বড়লোকদের এক রকম চেহারা হয়, তাদের চেহারা সেরকম। একজনের মাথায় চুল পাতলা হয়ে এসেছে, অন্যজনের বড় বড় গোঁফ এবং চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। আমরা ভারি পর্দার ভিতর দিয়ে মাথা গলিয়ে দুর্বল গলায় বললাম, স্যার আমাদের ডেকেছেন?

হ্যাঁ, ডেকেছি। এসো। হেডস্যার কথা শেষ করে আমাদের দিকে হাসিমুখে তাকালেন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, আমি হেডস্যারকে কখনো হাসতে দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। শুধু তাই নয়, স্যারের গলার স্বর মাখনের মত নরম, আমাদের নিজেদের কানকে বিশ্বাস হল না।

আমরা সাবধানে ভিতরে ঢুকলাম, এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত না ব্যাপারটা কোন রকম রসিকতা কিনা। হেডস্যার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সলীল আর মুনীর?

জী স্যার। আমি মুনীর।

সলীল বলল, আমি সলীল।

হেডস্যার লোক দুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই যে, যে দুজনকে আপনারা খুঁজছেন।

লোক দুজন আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল, খুব চেষ্টা করছে হাসি হাসি মুখ করে তাকাতে, কিন্তু কেন জানি আমার মনে হল লোক দুজন কোন কারণে আমাদের উপর রেগে আছে। টাক মাথার মানুষটি মুখের হাসিটাকে আরো বড় করে গলায় মধু ঢেলে বলল, খোকারা, কেমন আছ?

ভাল।

বেশ। বেশ। বেশ। লোকটা পুতুলের মতো মাথা নেড়ে আবার বলল, বেশ। বেশ। বেশ।

দুই নম্বর মানুষটি, যার চোখে চশমা এবং নাকের নিচে বড় বড় গোঁফ, মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, আমার ঢাকা থেকে এসেছি, বিকেলের ট্রেনে চলে যাব।

আমি আর সলীল দুজনেই লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের ডেকে পাঠানোর সাথে বিকেলের ট্রেনে তাদের ঢাকা ফিরে যাবার কি সম্পর্ক এখনো ঠিক বুঝতে পারলাম না।

টাক মাথার লোকটি বলল, আমরা এখানে এসেছি একটা বিজনেসের ব্যাপারে।

চশমা চোখের লোকটি বলল, আমাদের অনেক রকম বিজনেস। গার্মেন্টস,

শিপিং, প্লাস্টিক, আরো অনেক কিছু।

টাক মাথার লোকটা বলল, আহসান এন্টারপ্রাইজ বললে সবাই এক নামে চেনে। যাই হোক যেটা বলছিলাম, আমরা একটা জমি কিনব প্রফেসর জহুরুল চৌধুরীর কাছে থেকে। অংকের প্রফেসর—

টাক মাথার মানুষটি হঠাৎ খুব জোরে জোরে হাসতে শুরু করল, যেন অংকের প্রফেসর হওয়া খুব একটা হাসির ব্যাপার। আমি আর সলীল একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম, তখনো রহস্যটার সমাধান হয়নি কিন্তু যোগাযোগটা কিভাবে হয়েছে মনে হয় একটু একটু আন্দাজ করেত পারছি।

চশমা চোখের মানুষটি বলল, প্রফেসর সাহেব খুব মজার মানুষ। খুব খেয়ালী মানুষ!

জ্ঞানী মানুষেরা সাধারণত খেয়ালী হয়। প্রফেসর জি. সি. দেব ছিলেন জ্ঞানী মানুষ। একবার নাকি ক্লাসে ভুল করে মশারী পরে চলে এসেছিলেন! পাকিস্তান আর্মী মেরে ফেলেছিল সেভেন্টি ওয়ানে। দেশের একটা বিগ লস। চশমা চোখের মানুষটা জিব দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করল।

টাক মাথার মানুষটা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, খোকারা, তোমরা বিশ্বাস করবে না, প্রফেসর জহুরুল চৌধুরী কি রকম মজার মানুষ শুনো। তার কাছ থেকে আমরা, আহসান এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড, একটা জমি কিনছি। আর প্রফেসর সাহেব কি করলেন জান?

কি?

বলেছেন একটা কাগজে তোমাদের দুজনের সিগনেচার নিয়ে আসতে! সেই কাগজে তোমরা লিখে দেবে "এই জমি বিক্রি করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।" টাক মাথার মানুষটি আবার দুলে দুলে হাসতে শুরু করল।

চশমা চোখের মানুষটি আঙুল দিয়ে তার বড় বড় গোঁফ টানতে টানতে বলল, তোমাদের মনে হয় খুব স্নেহ করেন। গাছের উপরে একটা ঘর তৈরি করছেন, সেখানে নাকি তোমরা গিয়েছ?

আমরা মাথা নাড়লাম।

চশমা চোখের মানুষটি হঠাৎ মুখটাকে একজন দার্শনিকের মত করে বলল, আসলে যারা বড় মানুষ তারা সব সময় বাচ্চাদের ভালবাসেন। বাচ্চাদের মাঝে এক ধরনের ইনোসেন্স থাকে যেটা আমরা টের পাই না। যারা সত্যিকারের বড় মানুষ তারা সেটা চট করে ধরতে পারে।

টাক মাথার মানুষটি আবার পুতুলের মত জোরে জোরে মাথা নাড়ল। চশমা চোখের মানুষটি টেবিলের উপরে রাখা কাগজটা আমাদের দিকে এগিয়ে বলল, আমি তোমাদের ঝামেলা কমানোর জন্যে কাগজে টাইপ করে এনেছি — "এই জমি বিক্রি করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই"। তোমরা নিচে তোমাদের নাম লিখে দাও। কিসে

লিখবে? ইংরেজিতে, না বাংলায়?

সলীল একটু গলা পরিস্কার করে বলল, কিন্তু আমাদের আপত্তি আছে।

অ্যাঁ? মনে হল মানুষটা ঠিক বুঝতে পারল না সলীল কি বলছে।

আমাদের আপত্তি আছে। ঐ জায়গাটা বিক্রি করায় আমাদের আপত্তি আছে।

তোমাদের আপত্তি আছে?

হ্যাঁ। আমি আর সলীল মাথা নাড়লাম।

জমিটা কি তোমাদের? তোমার ফ্যামিলির?

না।

তাহলে তোমার আপত্তি আছে মানে?

তবু আপত্তি আছে। জায়গাটা খুব সুন্দর, স্কুল ছুটি হলে আমরা সেখানে বেড়াতে যাই। আপনারা জায়গাটা কিনে সেখানে ইটের ভাটা বানাবেন। সব গাছ কেটে ফেলবেন। আমাদের সে জন্য আপত্তি আছে।

লোক দুজন আস্তে আস্তে রেগে উঠল। মানুষ রেগে গেলে তাদের খুব খারাপ দেখায়, এই দুজনকেও খুব খারাপ দেখাতে লাগল। মাথায় টাক মানুষটাকে কেমন যেন মোষের মত দেখাতে লাগল। সে ফোঁৎ করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, এটা মশকরা করার জায়গা না। নাও এখানে সাইন কর।

উঁহু। লোকটা এবারে হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার, একটু বলবেন সাইন করতে।

হেডস্যার এতক্ষণ খুব কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়েছিলেন। লোকটার কথা শুনে বললেন, আমার বলা তো ঠিক হবে না। আমি তো এর আগে পিছে কিছুই জানি না। প্রফেসর সাহেব যখন এদের অনুমতি চাইছেন, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। আমি তাদের পড়াশোনা করতে বলতে পারি, হোমওয়ার্ক করতে বলতে পারি, কিন্তু এটা তো বলতে পারি না।

আমি আর সলীল কৃতজ্ঞ চোখে হেডস্যারের দিকে তাকালাম। কখনো বুঝতে পারিনি স্যার এরকম একটা কথা বলবেন। মনে করেছিলাম, কাগজটাতে সাইন করার জন্যে এমন একটা ধমক দেবেন যে, আমরা একেবারে কাপড় ভিজিয়ে ফেলে ছুটে গিয়ে সাইন করব।

চশমা চোখের লোকটি তার গোঁফে টান দিতে দিতে হেডস্যারের দিতে ঝুঁকে পড়ে বলল, কিন্তু স্যার, আপনি বুঝতে পারছেন না! অনেক বড় বিজনেস ডিল, একজন মানুষের পাগলামির জন্যে তো নষ্ট হতে পারে না।

পাগলামো?

অফকোর্স। প্রফেসর সাহেব বদ্ধ পাগল। জেলখানায় না হয় পাগলা গারদে আটকে রাখার কথা। বয়স্ক মানুষ, একটা গাছের উপর বসে থাকে, চিন্তা করতে পারেন?

মোটেও পাগল না। আমি গলা উঁচিয়ে বললাম, জাবুল চৌধুরী মোটেই পাগল না। অনেক ভালমানুষ।

টাক মাথার মানুষটি হঠাৎ গলা উঁচিয়ে বলল, দেখি, আমি দুজনের সাথে একটু কথা বলে দেখি। আস খোকারা, আমার কাছে আস। কি যেন নাম জামাল আর কি —

সলীল আর মুনীর।

ও আচ্ছা। সলীল আর মুনীর। আস, কাছে আস।

আমরা এগিয়ে গেলাম।

বুঝেছ খোকারা, এটা অনেক বড় ব্যাপার। দেশের উন্নতির জন্যে কলকারখানা তৈরি করতে হয়, বাড়িঘর তৈরি করতে হয়। তার জন্যে ইট লাগে, সিমেন্ট লাগে। ইট তো আর গাছে ধরে না, ইট তৈরি করতে হয়। সে জন্যে ইটের ভাটা খুব জরুরি। আর তাই আমাদের এই জায়গাটা দরকার। এমনিতে পড়ে আছে, জংলা জায়গা, সাপখোপের আড্ডা। তোমাদের কি দেখে ভাল লাগল কে জানে। যাই হোক, ভাল যখন লেগেছে তোমরা এখানে যখন খুশি বেড়তে আসবে। আমি বলে রাখব, যখন খুশি তোমরা আসতে পারবে।

ইটের ভাটায়?

মানুষটা না শোনার ভান করে বলল, তোমরা যদি এই কাগজটায় সাইন করে দাও তাহলে কি করব জান?

কি?

দুইজনকে দুইটা সাইকেল কিনে দেব। নতুন সাইকেল। একেবারে ব্রাণ্ড নিউ। কি বল, হ্যাঁ?

নতুন সাইকেল? আমার বুকের ভিতর একেবারে ছলাৎ করে উঠে। সলীল অবশ্যি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, বলল, সাইকেল চাই না।

তাহলে কি চাও?

কিছু চাই না।

মানুষ দুজন চোখ দুটি দিয়ে আগুন বের করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা চোখ সরালাম না, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। খানিকক্ষণ এভাবে কেটে গেল, তখন হঠাৎ একজন উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে একটা থাবা দিয়ে বলল, এই জন্যে সব সময় বলি পাগল ছাগলের সাথে কখনো বিজনেস করতে হয় না।

অন্যজনও তখন উঠে দাঁড়াল, টেবিল থেকে কাগজটা নিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, ছেলেপিলে ঠিক করে মানুষ হয় না আজকাল। আমাদের সময় শক্ত পিটুনি দেয়ার নিয়ম ছিল, বেয়াদব ছেলেরা একেবারে সিদে হয়ে যেতো।

হেডস্যার হাসি হাসি মুখে বললেন, আমি মাস্টার মানুষ, আমিও বেয়াদপি একেবারে সহ্য করি না। আমার ছেলেরা আর যাই করুক কোন বেয়াদবি করেনি।

মানষ দুইজন নাক দিয়ে এক ধরনের শব্দ করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে

গেল। হেডস্যার সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথা নাড়লেন, তাঁকে দেখে মনে হতে লাগল যেন খুব মজার একটা জিনিস দেখেছেন।

আমি হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে বললাম, যাব স্যার আমরা?

যাও।

আমরা বের হয়ে যাচ্ছিলাম, হেড স্যার আবার জিজ্ঞেস করলেন, দিনরাত শুধু বন জংগলে ঘোরাঘুরি কর, নাকি পড়াশোনাও কর?

পড়াশোনাও করি স্যার।

রোল নাম্বার কত?

তিন।

হেডস্যার আমার দিকে তাকালেন, আমি উদাস উদাস মুখ করে বললাম, তেইশ।

তেইশ? পড়াশোনা করলে রোল নাম্বার তেইশ হয় কেমন করে?

আমি কিছু বললাম না, বলার কিছু ছিলও না। হেডস্যার বললেন, যাও ক্লাসে যাও।

আমরা বের হয়ে যাচ্ছিলাম, হেডস্যার আবার আমাদের থামালেন, যে জায়গাটা নিয়ে এত হৈ চৈ সেটা কি আসলেই সুন্দর?

জ্বী স্যার। অপূর্ব সুন্দর জায়গা। সলীল হাত নেড়ে বলল, আপনি দেখলে মুগ্ধ হয়ে যাবেন।

একবার নিয়ে যেও তো আমাকে।

নিয়ে যাব স্যার। আপনি বললে আমরা নিয়ে যাব। আপানার যখন ইচ্ছে।

আর ঐ প্রফেসর সাহেব, সত্যিই কি গাছের উপর থাকেন?

সব সময় না স্যার, মাঝে মাঝে। গাছের উপর চমৎকার ঘর স্যার, থাকতে কোন অসুবিধে নেই।

ও, আচ্ছা। ঠিক আছে তোমরা যাও।

আমরা বাইরে যেতে যেতে দেখলাম, হেড স্যার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। বাইরে দুটি বড় বড় গাছ, স্যার সেই গাছের দিকে কেমন জানি একরকম মুখ করে তাকিয়ে আছেন। কে জানে স্যারের হয়তো ছেলেবেলার কথা মনে পড়েছে!

৮. ওষুধ ফ্যাক্টরি

বাসায় এসে দেখি বাইরে লুঙ্গি ঝুলছে এবং ভিতর থেকে বাবার জিব পরিস্কার করার বিকট শব্দ বের হচ্ছে। পা টিপে টিপে ভিতরে ঢুকে দেখলাম, রান্নাঘরে মা রাঁধছেন এবং রান্নাঘরের দরজার পিছনে লাবলু দাঁড়িয়ে ফোঁসফোঁস করে কাঁদছে। আমি টেবিলের উপর বইগুলি রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। শিউলি গাছটা বেশ বড়োসরো হয়েছে। নিচে আর কোন ডাল নেই, বাবা আজ কোন ডালটা ভাঙবেন কে জানে। আমি

বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললাম। সলীলের সাথে বাসা থেকে পালিয়েই যেতে হবে, এভাবে আর থাকা যায় না।

সে রাত্রে খুব একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল, বাবা আমাদের মারলেন না। মারতে চাননি সেটা অবিশ্যি সত্যি নয়, কিন্তু ঠিক সময় করে উঠতে পারলেন না। মগরেবের নামাজ পড়েই বাবা টেবিলের ওপর কয়েকটা খবরের কাগজ বিছিয়ে কি একটা কাজ শুরু করে দিলেন। টেবিলের ওপর শিশি বোতল প্যাকেট রাখতে রাখতে বাবা আমাকে আর লাবলুকে খুব খারাপ খারাপ কথা বলে গালি দিতে লাগলেন। আমাকে বললেন শুওরের বাচ্চা, বদমাইশ, জানোয়ার এবং হারামখোর। লাবলুকে বললেন কুত্তার বাচ্চা, ইবলিশ, বেতমিজ এবং জুতাচোর। হ্যাঁচকা টান মেরে আমার কান ছিঁড়ে ফেলবেন এবং চড় মেরে লাবলুর সবগুলি দাঁত ফেলে দেবেন বলে হুমকি দিতে লাগলেন। গালিগালাজ এবং এরকম হম্বিতম্বিকে আমি অবিশ্যি বেশি ভয় পাই না। সত্যিকার পিটুনী হলে অন্য কথা।

যে কাজটা করার জন্যে বাবা আমাদের মারতে পর্যন্ত সময় পাচ্ছেন না সেটা কি আমার খুব জানার কৌতূহল হচ্ছিল। বাবা সেটা লুকানোর চেষ্টাও করলেন না, কাজেই আমরা সবাই দেখলাম। প্রত্যেকবার বাবা অফিস থেকে ওষুধ চুরি করে আনেন। এবারে শুধু ওষুধ নয়, ওষুধের সাথে অনেকগুলি ওষুধের খালি বাক্স আর শিশি এনেছেন। সাথে আরেকটা ঠোঙা ভর্তি ক্যাপসুল। ক্যাপসুলগুলি খালি। ক্যাপসুল যে খালি হতে পারে এবং সেটাকে টেনে খুলে ফেলা যায় আমি জানতাম না। বাবা সেই ক্যাপসুলগুলি খুলে ভিতরে একটু ময়দা ভরে সেগুলি আবার বন্ধ করে রাখতে লাগলেন। তারপর ওষুধের শিশির মাঝে গুনেগুনে কুড়িটা করে ক্যাপসুল রেখে মুখটা বন্ধ করে বাক্সের মধ্যে রাখতে শুরু করলেন। একেবারে নিখুঁত কাজ, দেখে আমাদের তাক লেগে গেল। বাবার মুখ গম্ভীর দেখে মনে হয় সাংঘাতিক একটা জরুরি কাজ করছেন।

মা এসে একবার জিজ্ঞেস করলেন, কি করছেন?

বাবা মুখ খিঁচিয়ে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বললেন, চোখের মাথা খেয়েছ? দেখছ না একটা কাজ করছি, তার মাঝখানে এসে কথা বল। আক্কেল নাই তোমার?

বাবার ধমক খেয়ে মা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেলেন।

ঘণ্টা দুয়েকের মাঝে বাবা সবগুলি ওষুধ তৈরি করে তাঁর বাজারের ব্যাগের মধ্যে ভরে বের হয়ে গেলেন। লাবলু তখনো বিশ্বাস করতে পারছিল না যে আজ আমরা মার খাইনি। দাঁত বের করে হেসে বলল, বাবা মারেন নাই আজকে।

আমি বললাম, না।

কেন মারেন নাই?

সময় পান নাই। মনে হয় কালকে ডাবল মার হবে।

কালকেরটা কাল, লাবলুকে সেটা নিয়ে খুব চিন্তিত দেখা গেল না। হাসি হাসি মুখে বলল, কেন সময় পান নাই?

দেখিস নাই, ওষুধের ফ্যাক্টরী খুলেছেন বাসায়।

লাবলু চোখ বড় বড় করে বলল, কেমন করে ওষুধ বানাতে হয় বাবা জানেন?

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, তুই একটা আস্ত গাধা।

লাবলু চোখ পাকিয়ে বলল, খবরদার, আমাকে গাধা বলবে না।

বাবা কি করেছে তুই দেখিসনি?

কি করেছে?

বসে বসে ভেজাল ওষুধ তৈরি করেছে, তারপর সেই ওষুধ নিয়ে গেছে বিক্রি করার জন্যে।

ভেজাল ওষুধ?

হ্যাঁ। দেখিসনি, ক্যাপসুলগুলি খুলে তার মাঝে ময়দা ঢুকিয়েছে। দেখিসনি?

লাবলু বোকার মত মাথা নাড়ল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ভেজাল ওষুধ খেলে কি হয়?

অসুখ ভাল হয় না। অসুখ যদি বেশি হয় তাহলে মানুষ মরে যায়।

মরে যায়? লাবলুর মুখ কেমন জানি ফ্যাকাসে হয়ে গেল, সত্যি মরে যায়?

এত অবাক হচ্ছিস কেন? মানুষ অসুখ হয়ে মরেছে তুই কোনদিন শুনিসনি?

লাবলু মাথা নাড়ল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ঢোক গিলে বলল, বাবা মানুষকে মেরে ফেলবে?

মারতেও তো পারে।

সত্যি?

আমি রেগে বললাম, ধেত্তেরী ছাই! ঢং করিস না। দেখছিস না, আমাদের দুইজনকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে কোনদিন।

লাবলু আর কোন কথা বলল না, কেমন জানি মনমরা হয়ে বসে রইল।

পরদিন স্কুল ছুটির পর আমি আর সলীল জাকুল চৌধুরীর সাথে দেখা করতে রওনা দিলাম। আমাদের কথা শুনে এত সুন্দর জায়গাটা বিক্রি করেন নাই, আমাদের গিয়ে অন্ততঃ তাঁকে সেজন্যে কিছু একটা বলে আসা দরকার।

দুজনে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, তার মাঝে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা সলীল, তোকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি।

কি জিনিস?

যদি তুই দেখিস একটা মানুষ এমন একটা কাজ করছে যেটা খুব খারাপ —

সলীল আমাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কত খারাপ?

খুব খারাপ।

কত খুব খারাপ?

এত খারাপ যে—আমি একটু ইতঃস্তত করে বলেই ফেললাম, এত খারাপ যে সে

জন্যে মানুষ মারা যেতে পারে।

সলীল রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, সর্বোনাশ!

যদি তাই দেখিস তাহলে তুই কি করবি?

আমি সেই মানুষকে সেই কাজ করতে দিব না। কিছুতেই না।

কিন্তু তুই যদি সেই মানুষকে খুব ভয় পাস?

কত ভয়?

খুব বেশি ভয়।

কত খুব বেশি?

এত খুব বেশি যে তাকে দেখলে তোর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। যে যখন খুশি তোকে মারতে পারে। যে এমন মার মারে যে—

সলীল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তোর বাবা? মিস্টার স্যাডিস্ট?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, সেটা আমি বলব না। কিন্তু যদি সেরকম একজন মানুষ হয় এরকম খারাপ কাজ করে তাহলে তুই কি করবি?

সলীল অনেকক্ষণ তার মাথা চুলকাল। আকাশের দিকে তাকাল, মাটির দিকে তাকাল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, তাহলে আমি কি করব আমি জানি না। কঠিন সমস্যা। অনেক কঠিন সমস্যা।

আমি আর সলীল কোন কথা না বলে রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকলাম। ছোট মানুষের বড় সমস্যা খুব সহজ জিনিস নয়।

জারুল চৌধুরীর বাসায় গিয়ে দেখি তাঁর গাছঘরটা মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে। গাছঘরটা যেটুকু সুন্দর হবে ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি সুন্দর। উপরে ছাদ দেয়া হয়েছে, এক পাশে বড় জানালা। সামনে ছোট বারান্দা, সেখানে পা ঝুলিয়ে বসে বসে জারুল চৌধুরী একটা ইংরেজি বই পড়ছেন। আমাদের দেখে একগাল হেসে বললেন, আরে! মানিকজোড় দেখি! কি খবর তোমাদের?

আমার হেসে বললাম, আমাদের স্কুলে দুজন মানুষ গিয়েছিল। দুজনেই মোটা আর ফরসা। একজনের মাথায় টাক, আরেকজনের চোখে চশমা। একজন—

জানি! জানি! জারুল চৌধুরী মাথা নেড়ে বললেন, আরেক মানিকজোড়। আমি পাঠিয়েছিলাম, ফিরে এসে সে কি রাগারাগি! যখন উল্টাপাল্টা কথা বলতে শুরু করল, ধমক দিয়ে বের করে দিলাম।

কি উল্টাপাল্টা কথা বলেছে?

আজেবাজে কথা। আমাকে নাকি লোক লাগিয়ে খুন করে ফেলবে! জারুল চৌধুরী হা হা করে হাসলেন যেন খুব মজার ব্যাপার হয়েছে একটা।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, সত্যি সত্যি যদি খুন করে ফেলে?

আরে ধুর! মানুষ খুন করা এত সোজা নাকি? রাজাকার বাহিনী, বদর বাহিনী

আমাকে খুন করতে পারে নাই, আর সেদিনের দুই পুচকে ছোড়া আমাকে খুন করবে! মাথা খারাপ নাকি তোমাদের?

আমরা গাছঘরে বসে বসে জারুল চৌধুরীর সাথে বেশ অনেকক্ষণ কথা বললাম। খুব মজা করে গল্প করেন জারুল চৌধুরী আর সবচেয়ে যেটা চোখে পড়ার মত সেটা হচ্ছে, আমাদের সাথে এমনভাবে কথা বলেন যেন আমরা ছোট না, তাঁর মতই বড় মানুষ। গাছঘরটা শেষ করে এখন একটা নৌকা কিনবেন ঠিক করেছেন। সেই নৌকায় করে নাকি নৌকা ভ্রমণে বের হবেন। নৌকায় থাকা, নৌকায় খাওয়া। রাত্রিবেলা হারিক্যান জ্বালিয়ে বই পড়বেন। শুনে আমাদের এমন লোভ লাগল যে বলার নয়।

জারুল চৌধুরী বললেন আমরা যখন খুশি তাঁর গাছঘরে আসতে পারি। এমনিতে গাছঘরে তালা দেয়া থাকবে। নিচে গাছের ফোকড়ে একটা ছোট প্লাস্টিকের কৌটায় চাবিটা রাখবেন। গাছঘরে শুকনো খাবার, পড়ার বই, স্লিপিং ব্যাগ, মোমবাতি সব কিছু রাখা থাকবে। আমরা যদি চাই কোনদিন রাতেও এসে থাকতে পারি।

জারুল চৌধুরীর সাথে যখন কথা বলছিলাম তখন হঠাৎ সলীল আমাকে কনুই দিয়ে খোঁচা দিয়ে ফিসফিস করে বলল, জারুল স্যারকে বলবি?

কি?

তোর সেই কঠিন সমস্যাটা?

আমি প্রথমে মাথা নেড়ে বললাম, না না না—

কেন না?

আমার লজ্জা করছিল এবং সেটা বলতেও আমার লজ্জা করল। সলীল তখন আবার খোঁচা দিয়ে বলল, বল না।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখলাম। আসলেই ব্যাপারটা খারাপ হয় না। জারুল চৌধুরী মনে হয় বলতে পারবেন কি করা যায়। আমি একটু ইতঃস্তত করে সমস্যাটা খুলে বললাম, মানুষটা যে বাবা সেটা আর বললাম না, কিন্তু মনে হল তিনি বুঝে গেলেন।

আমার কথা শুনে তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমার শুনে খুব খারাপ লাগল মুনীর যে তুমি এত ছোট মানুষ কিন্তু তোমার এত বড় সমস্যা। কিন্তু মুনীর, জেনে রাখ, তুমি একা না। তোমার মত অনেকে আছে। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমারও একই সমস্যা ছিল। বড় বড় মানুষ ছিল যাদেরকে লোকজন সম্মান করত কিন্তু আমি জানতাম তারা কত বড় বদমাইশ। আমি ছোট ছিলাম, তাই ভান করতাম কিছু বুঝি না, কিন্তু আসলে সবই বুঝতাম। তোমাদের এরকম হয় না?

আমরা মাথা নাড়লাম।

তোমাদের শুধু একটা জিনিস বলে রাখি। তোমরা যেটা সত্যি জান কখনো সেটা থেকে বিশ্বাস হারাবে না। বড় মানুষেরা বদমাইশ হয় হোক, তোমরা কখনো বদমাইশ

হবে না। বড় মানুষেরা যে কাজ করে তার সব কাজ ভাল সেটা সত্যি না।

আমরা আবার মাথা নাড়লাম।

আর মুনীর, তোমার যে সমস্যা সেটা খুব সহজ সমস্যা না। অনেক কঠিন সমস্যা। এটা সমাধান করতে হবে বুদ্ধি খাটিয়ে। তোমরাও ভাব, আমিও ভাবি। নিশ্চয়ই একটা বুদ্ধি বের হবে। যদি কোন বুদ্ধি বের করতে পার আগে আমাকে জানিও। তারপর দেখি কি করা যায়। কি বল?

আমি আর সলীল আবার মাথা নাড়লাম।

বাসায় আসার সময় আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকলাম। সত্যি কথা বলতে কি, বাসায় আসতে আসতে বেশ কয়েকটা বুদ্ধি বের হয়ে গেল।

৯. খুন

বিকাল বেলা বাসা থেকে বের হচ্ছি, দেখি, সিঁড়িতে জয়নাল বসে আছে। জয়নাল হাসিখুশি মানুষ, কোন সময় মন খারাপ করে থাকে না। যখন তার হাসিখুশি হওয়ার কোন কারণ নেই তখনো সে হাসিখুশি। আজকে কিন্তু জয়নালকে দেখে মনে হল তার মন খারাপ। গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেও কিছু বলল না। আমি কাছে গিয়ে বললাম, কি রে জয়নাল!

তবু সে উত্তর দিল না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কি রে জয়নাল? কি হয়েছে?

জয়নাল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার রশীদের কথা মনে আছে?

রশীদ? আমি মনে করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে করতে পারলাম না।

জে। রশীদ। মিনতির কাজ করত। একদিন নদীর ঘাটে নতুন কাপড় পরে এসেছিল। তখন আমি —

হ্যাঁ হ্যাঁ, যে তোকে ফিরিশতার মত ডাক্তার নাওয়াজের খোঁজ দিয়েছে?

জয়নাল চমকে উঠে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, শ স্ স্ স্ আস্তে। কেউ শুনবে।

কে শুনবে? কেউ নাই এখানে। কি হয়েছে রশীদের?

মরে গেছে।

মরে গেছে? আমি চমকে উঠে বললাম, মরে গেছে?

জে।

কেমন করে মরে গেল?

পানিতে ডুবে।

পানিতে ডুবে? আমি অবাক হয়ে বললাম, সাঁতার জানত না?

জয়নাল একটু হাসার মত ভঙ্গি করে বলল, কি বলেন আপনি মুনীর ভাই। পানির

পোকা ছিল একেবারে। মাছের মত সাঁতার দিত।

তাহলে ডুবে গেল কেন?

জয়নাল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার কি মনে হয় জানেন?

কি?

কেউ একজন মেরে পানিতে ফেলে দিয়েছে। লুঙ্গির খুট দিয়ে চোখ মুছে জয়নাল বলল, রশীদ পানিতে ডুবে মরার মানুষ না। শুক্রবারে দেখা হল ভাল মানুষ। তারপর দেখা নাই। এখন শুনি মরে গেছে। বিশ্বাস হয়?

জয়নাল!

জে?

তুই জানিস আমার কি মনে হয়?

কি?

নাওয়াজ খান মেরেছে।

জয়নাল এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি বললাম, নাওয়াজ খান অনেক ডেঞ্জারাস মানুষ!

আপনি কি বলেন মুনীর ভাই! ফিরিশতার মত মানুষ—

না জয়নাল। নাওয়াজ খান ফিরিশতার মত মানুষ না—

আপনি কেমন করে জানেন?

আমি? আমি—মানে ইয়ে—আমি আমতা আমতা করে থেমে গেলাম, আমি আর সলীল যে তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম সেটা বলতে পারলাম না। জয়নাল সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমাদের ক্লাসের একজন চিনে। সে বলেছে।

জয়নাল আমার কথা ঠিক বিশ্বাস করল বলে মনে হল না। মাথা নেড়ে বলল, একজন ভাল মানুষের বদনাম করা ঠিক না।

তুই কেমন করে জানিস সে ভাল মানুষ?

আমি জানি। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের কেউ খোঁজখবর নেয় না। ডাক্তার সাহেব আমাদের খোঁজখবর নেন। টাকা পয়সা দেন।

জয়নাল, তুই আমার কথা শোন। খবরদার, তুই আর কোনদিন গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিকে যাবি না। খবরদার।

জয়নাল আমার কথার উত্তর দিল না। মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, রশীদ ছাড়া তোর পরিচিত আর কেউ মারা গেছে?

জয়নাল মাথা নাড়ল, না। কেউ মারা যায় নাই। খালি—

খালি কি?

তালেব আলী — জয়নাল অনিশ্চিতের মত থেমে গেল।

তালেব আলী কি?

তালেব আলীর খোঁজ নাই আজ কয়েক মাস।

তালেব আলীটা কে?

আরেকজন মিস্তি।

তার খোঁজ নেই?

না। কিন্তু তালেব আলী পাগলা কিসিমের। মনে হয় নিজেই কোথাও চলে গেছে।

তালেব আলী কি তোর ফিরিশতা ডাক্তারের কাছে যেতো?

জয়নাল দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল।

আর কেউ কি মারা গেছে কিংবা হারিয়ে গেছে?

রইস।

রইসটা কে?

জুতা পালিশ করত। বাপের সাথে ঝগড়া করে চলে গেল।

কোথায় চলে গেল?

কেউ জানে না। রইসের অনেক মাথা গরম।

তুই কেমন করে জানিস মাথা গরম? নাওয়াজ খান হয়তো —

জয়নাল ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, না মুনীর ভাই। গরিব মানুষের পোলাপান এইভাবেই মানুষ হয়। এক জায়গায় কয়দিন থাকে, তারপর সেখান থেকে আরেক জায়গায়। তারপর আরেক জায়গায়।

কি বলিস তুই জয়নাল?

ঠিকই বলি।

তিন তিনজন ছেলে তোর ফিরিশতা ডাক্তারের কাছে যেতো। তিনজনই শেষ আর তুই বলছিস—

বড় মানুষেরা বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে যেভাবে মাথা নাড়ে জয়নাল সেভাবে মাথা নাড়ল, তারপর বলল, মুনীর ভাই, গরিবের পোলাপান মরে অনেক বেশি। সেইদিন একজন ট্রাকের নিচে পড়ে শেষ। এখন আপনি কি বলবেন সেইটাও ডাক্তার সাহেব মেরেছে?

তা আমি জানি না। কিন্তু তুই — খবরদার, আর কখনো গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিকে যাবি না। ঠিক আছে?

জয়নাল কিছু না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বল্, তুই আর কোন দিন যাবি না। বল্।

জয়নাল খুব অনিচ্ছার সাথে বলল, ঠিক আছে যাব না।

তার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারলাম সে কথাটা বলেছে আমাকে ঠাণ্ডা করার জন্যে। যখন দরকার হবে তখন সে ঠিকই যাবে তার ফিরিশতার মত ডাক্তার নাওয়াজ খানের কাছে! আমার কথা সে একটুও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু আমি আর কি করতে পারি?

জয়নালের কাছে রশীদের খুন হয়ে যাবার খবর পেয়ে আমি গেলাম সলীলের সাথে দেখা করার জন্যে। সলীল বাসায় নেই, তার কোন মাসীর বাড়ি বেড়াতে গেছে। আমি কি করব বুঝতে না পেরে ফিরে আসছিলাম চৌরাস্তার মোড়ে হঠাৎ মীনা ফার্মেসীটা চোখে পড়ল। এটা মতি মিয়ার ফার্মেসী, বাবা এখানে ওষুধ বিক্রি করেন।

ফার্মেসীতে মতি মিয়া আর তার একজন কর্মচারী বসে ছিল। এই কর্মচারীটি নতুন এসেছে, কমবয়সী হাসিখুশি একজন মানুষ। মতি মিয়া আমাকে দেখে থামাখা একটু মাতব্বরীর ভান করে বলল, কি খবর?

আমি বললাম, ভাল।

পড়াশোনা কর, নাকি খালি ঘোরাঘুরি?

আমার একটু মেজাজ গরম হল, নিজে চোরাই ওষুধ বিক্রি করে কিন্তু আমার উপর খবরদারি। আমি মুখ শক্ত করে বললাম, খালি ঘোরাঘুরি।

আমার কথা শুনে কমবয়সী হাসিখুশি কর্মচারীটি হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠল, কিছুতেই আর হাসি থামাতে পারে না। মতি মিয়া চটে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি বললে?

না, কিছু না।

অন্য মানুষটি তখনো হেসে যাচ্ছে, মতি মিয়া তাকে জোরে একটা ধমক দিল, চুপ করবে তুমি?

মানুষটির হাসার রোগ আছে, অনেক কষ্ট করে নিজেকে থামাল। মতি মিয়া আমার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, মুরুব্বীদের সাথে এইভাবে কথা বলা ঠিক না। আদব-লেহাজ বলে একটা কথা আছে।

আমি আর কথা বাড়ালাম না, দাঁড়িয়ে রইলাম। মতি মিয়া খানিকক্ষণ গজ গজ করে একসময় উঠে দাঁড়িয়ে তার কর্মচারীটিকে বলল, দোকানটা দেখ, আমি বাজারটা সেরে আসি।

জি আচ্ছা।

মতি মিয়ার পিছনে পিছনে আমিও উঠে যাচ্ছিলাম, কর্মচারীটি বলল, তোমার নাম কি?

আমি আমার নাম বললাম।

আজকে তুমি জব্বর দিয়েছ মতি মিয়াকে! জিজ্ঞেস করল, পড়াশোনা কর না কি খালি ঘোরাঘুরি। তুমি বললে ঘোরাঘুরি! হি হি হি হি —

লোকটা আবার হাসতে শুরু করে, কিছুতেই হাসি থামাতে পারে না। ব্যাপারটা মোটেও এত হাসির নয়, মানুষটার নিশ্চয়ই হাসির রোগ আছে। হাসি যত অর্থহীন হোক, এটা সব সময় সংক্রামক, একটু পরে আমিও হাসতে শুরু করলাম।

লোকটা ফার্মেসীর একটা আলমারি খুলে কি একটা কৌটা বের করে সেখান থেকে দুইটা ট্যাবলেট বের করে একটা টপ করে মুখে দিয়ে আরেকটা আমার দিকে এগিয়ে

দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি এটা?

খেয়ে দেখ। ভিটামিন সি। অনেক মজা খেতে।

আমি সাবধানে মুখে দিয়ে দেখি সত্যিই তাই। চুষে চুষে খেতে খেতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি সব ওষুধ চিনেন?

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, না চিনলে চলে?

আমি লাল রঙের একটা বোতল দেখিয়ে বললাম, ঐটা কি ওষুধ, বলেন দেখি।

লোকটা মাথা চুলকে বলল, হয় ব্লাড প্রেশার না হয় ডায়াবেটিস।

সত্যি মিথ্যা কে জানে। আমি আরো কয়েকটা জিজ্ঞেস করলাম, লোকটা কিছু না কিছু বলে দিল। কথা শুনে মনে হল বানিয়েই বলছে — আমি অবিশ্যি সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। হঠাৎ আলমারিটার উপরে এক জায়গায় দেখি, বাবার ভেজাল ওষুধগুলি সাজানো। আমি হাত দিয়ে দেখিয়ে বললাম, ঐটা কিসের ওষুধ?

ঐটা এন্টিবায়োটিক্স।

সেটা দিয়ে কি হয়?

ইনফেকশান হলে খেতে হয়।

কিসের ইনফেকশান?

কত রকম ইনফেকশান আছে! কিডনি, লিভার, ব্রেন। লোকটা খুব গম্ভীর ভাব করে হাত নেড়ে বলল, এন্টিবায়োটিক্স ছাড়া আজকাল একটা দিনও যায় না।

হঠাৎ করে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি চোখে মুখে একটু অবাক হবার ভান করে বললাম, আমাকে ওষুধটা দেখাবেন? একটু দেখি।

লোকটা মুখে তাচ্ছিল্যের ভান করে ওষুধের বাক্সটা নামিয়ে এনে খুলে শিশিটা বের করে আমাকে দেখাল, বলল ক্যাপসুল।

আমি চোখে মুখে বিস্ময়ের ভান করে বললাম, কি সুন্দর! আমাকে একটা ক্যাপসুল দেবেন?

লোকটা খুব অবাক হয়ে বলল, তুমি ক্যাপসুল দিয়ে কি করবে?

সাজিয়ে রাখব।

লোকটা খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল আমি ঠাট্টা করছি কিনা। আমি চোখে মুখে যতটুকু সম্ভব একটা সরল ভাব ফুটিয়ে রাখার চেষ্টা করলাম। লোকটা বলল, ওষুধ কি সাজিয়ে রাখার জিনিস?

কি হয় সাজিয়ে রাখলে? মানুষ সুন্দর জিনিস সাজিয়ে রাখে না?

লোকটা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না, অসম্ভব বোকার মত কোন প্রশ্ন করলে তার উত্তর দেওয়া খুব মুশকিল। লোকটা খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার হি হি করে হাসতে শুরু করল, কিছুতেই আর হাসি থামাতে পারে না।

হাসতে হাসতে সে সত্যি সত্যি শিশিটা হাতে নিয়ে সেখান থেকে একটা ক্যাপসুল বের করে আমার হাতে দিয়ে দিল। আমি যখন ক্যাপসুলটা নিয়ে বের হচ্ছি তখনো সে

হি হি করে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

ভারি মজার মানুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাবার ভেজাল ওষুধের একটা প্রমাণ সে হাতে হাতে দিয়ে দিল, নিজে না জেনেই!

১০. বিস্ফোরণ

বৃহস্পতিবার দিনটিতে মনে হয় গোড়া থেকেই কিছু গোলমাল ছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি লাবলুর জ্বর। মাঝে মাঝেই কেন জানি লাবলুটার জ্বর উঠে। তখন কেমন যেন চুপচাপ হয়ে শুয়ে থাকে। দেখেই কেন জানি মন খারাপ হয়ে যায়।

স্কুলে গিয়েও গোলমাল। ক্লাস কেপ্টেন খামাখা আমার নাম লিখে স্যারের কাছে নালিশ করল, আমি নাকি ক্লাশে গোলমাল করেছি। স্যার তখন আমাকে একেবারে যা-তা বলে বকাবকি করলেন। জীবনের উপর বিতৃষ্ণা এসে গেল সেই বকাবকি শুনে।

টিফিন ছুটির সময় কাশেম আমার একটা বই কেড়ে নিল। লাইব্রেরি থেকে এনেছি, এখনো পড়া হয়নি। সেটা ফেরৎ নিতে গিয়ে মহা গোলমাল, ছোটখাট ধাক্কাধাক্কি ছাড়া অবশ্যি আর কিছু হল না, সলীল পাশে না থাকলে মনে হয় মার খেয়ে ভূত হয়ে যেতাম।

বিকাল বেলা হঠাৎ দেখি, কলম থেকে কালি চুইয়ে শার্টের পকেটটা মাখামাখি হয়ে গেছে, বাসায় পৌঁছানোর পর মা যা একটা কাণ্ড করবেন সেটা আর বলার নয়।

স্কুল ছুটির পর বাসায় আসতে আসতে রাস্তার মোড়ে আমি একটা আছাড় খেলাম। শুকনো ঠনঠনে রাস্তা, আছাড় খাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আমি তার মাঝে আছাড় খেয়ে ফেললাম। একটা দিন কেমন যাবে সেটা মনে হয় গ্রহ নক্ষত্র দিয়ে বিচার করা যায়। আজকে নিশ্চয়ই সবগুলি গ্রহ নক্ষত্র আমার জন্যে সবচেয়ে খারাপ খারাপ জায়গায় গিয়ে হাজির হয়েছে। আছাড় খেয়ে হাঁটুর ছাল উঠে গেছে কিন্তু সেটা নিয়ে আমি ব্যস্ত হতে পারলাম না। সামনে নিচু ক্লাসের কয়জন ছেলে ছিল, তারা এমন জোরে হাসতে শুরু করল যেন ভারি মাজার একটা ব্যাপার হয়েছে। মানুষ আছাড় খেলে যে দেখে হাসতে হয় না এই জিনিসটা মনে হয় কেউ তাদের শেখায়নি।

দিনটা যে খুব খারাপ যাচ্ছে সেটা নিয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম যখন বাসায় এসে দেখি, বাবা এসেছেন। অনেক দূর থেকে তাঁর ঘড়ঘড় শব্দ করে জিব পরিষ্কার করার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আজকে বাবার আসার কথা নয় কিন্তু আমার সর্বনাশ পুরো করার জন্যে মনে হয় একদিন আগে এসে হাজির হয়েছেন।

বাসায় ঢোকার আগে খানিকক্ষণ বারান্দায় বসে রইলাম। মনটা এত খারাপ হয়েছে যে বলার নয়। মনে হতে লাগল, সলীলের সাথে পালিয়ে গিয়ে বেদে হয়ে যাওয়াটা এমন কিছু খারাপ ব্যাপার নয়। পড়াশোনা করে কি হবে?

আমাকে দেখেই বাবার মুখ শক্ত হয়ে গেল কিন্তু আমাকে কিছু বললেন না। প্রত্যেকবারই বাবা পুরো ব্যাপারটা আগেরবার থেকে একটু ভিন্ন ভাবে করেন। কোন কথা না বলাটা মনে হয় একটা নতুন কায়দা।

আমি বাবাকে পাশ কাটিয়ে টেবিলের উপর বইগুলি রেখে রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হলাম। মা চুলা থেকে ডেকচিটা নামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, নতুন শার্টটা এইভাবে নষ্ট করেছিস?

কলম থেকে কালি বের হয়েছে—

মা গর্জন করে বললেন, সাবধানে রাখতে পারিস না? কোন জংগলের ভূত হয়েছিস তুই?

সস্তা কলম, আমি কি করব?

সস্তা কলম? মা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, লাট সাহেবের জন্যে সোনার কলম কিনে আনতে হবে!

আমি রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এলাম, এমনিতে বাবার পিটুনী খেয়ে আসছি, এখন তার সাথে মায়ের মুখ খিচুনী যোগ হল। জীবনের উপর বিতৃষ্ণা এসে গেল হঠাৎ। রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, তখন হঠাৎ দেখি বাবা শোবার ঘর থেকে লাবলুর কান ধরে টেনে আনছেন। লাবলুর মুখ ভয়ে একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে। একটু আগে দেখেছি জ্বরে কাহিল হয়ে লাবলু বিছানায় শুয়ে আছে। তাকে যে বাবা কান ধরে টেনে আনবেন আমি কখনো কল্পনাও করিনি।

আমার মাথার মাঝে হঠাৎ কেমন জানি একটু গোলমাল হয়ে গেল। কেমন করে হল বা কেন হল সেটা আমি জানি না কিন্তু কিছু একটা ঘটে গেল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি তখন হঠাৎ একটা অসম্ভব সাহসের কাজ করে ফেললাম। রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হুকুম দেওয়ার মত করে বললাম, বাবা, লাবলুকে ছেড়ে দেন।

বাবার মাথার উপর বাজ পড়লেও মনে হয় বাবা এত অবাক হতেন না। তাঁর মুখ মাছের মত হা হয়ে গেল, চোখ দুটি গোল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শুধু যে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন তাই নয়, সত্যি সত্যি লাবলুকে ছেড়ে দিলেন। তাঁকে দেখে মনে হতে লাগল তাঁর ভিতরে কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। কি হচ্ছে কিছুই আর বুঝতে পারছেন না। কয়েক সেকেন্ড সেভাবে গেল, তারপর হঠাৎ করে বাবা নড়ে উঠলেন, তাঁর চোখ মুখ হাত পা শরীর কেমন যেন কিলবিল করে উঠল। মুখ বন্ধ করে বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, কি বললি?

আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর পেছানোর উপায় নেই। গলার স্বরটাকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললাম, বলেছি লাবলুকে ছেড়ে দেন। ওর জ্বর উঠেছে, শুধু শুধু মারবেন না।

মা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এলেন। আমি চোখের কোণা দিয়ে দেখলাম, দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, মনে হয় নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। কি একটা

বলতে গিয়ে থেমে গেলেন, তারপর হঠাৎ শাড়ির আচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন।

লাবলু ছাড়া পেয়েও তখনো সরে যায়নি। অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ ভয়ে আরো সাদা হয়ে গেছে। একটু আগে ভয়টা ছিল নিজের জন্যে, এখন ভয়টা আমার জন্যে।

বাবা প্রচণ্ড রাগে কি করবেন বুঝতে না পেরে হঠাৎ একটা ট্রাকের মত আমার দিকে ছুটে এলেন, কাছে এসে একেবারে বাঘের মত আমার উপর লাফিয়ে পড়লেন।

আমি ব্যাপারটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম, ঠিক সময়মত একটা লাফ দিয়ে সরে গেলাম, বাবা আমাকে ধরতে পারলেন না। বাবা স্বপ্নেও এরকম একটা জিনিস চিন্তা করেননি। তাঁর একেবারে পুরোপুরি মাথা খারাপ হয়ে গেল। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকালেন।

রেগে গেলে মানুষের চেহারা খুব খারাপ হয়ে যায়। বাবার চেহারা এমনিতেই আগে কোনদিন আমার ভাল মনে হয়নি, এখন এই ভয়ংকর রাগে চেহারা এত খারাপ দেখাতে লাগল যে, দেখে আমার শরীর কেমন জানি শিউরে উঠে। চোখ দুটি লাল হয়ে আছে, নাকের গর্তগুলি বড় বড়, মুখ হা করে বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, মুখের ভিতরে ময়লা হলুদ দাঁত, থুতনিতে এক গোছা দাড়ি নড়ছে। কি কুৎসিত একটা দৃশ্য! বাবা গোঙানোর মত শব্দ করতে করতে চিৎকার করে বললেন, শুওরের বাচ্চা, আজকে আমি তোকে খুন করে ফেলব, একেবারে জবাই করে ফেলব।

বাবা সেই জায়গা থেকে আরেকটা লাফ দিলেন। আমি তখন মরীয়া হয়ে গেছি, আমি জানি আমাকে ধরতে পারলে বাবা আমার গলা টেনে ছিঁড়ে ফেলবেন। আমি আরো জোরে একটা লাফ দিয়ে সরে গেলাম, বাবা আমাকে ধরতে পারলেন না বরং তাল হারিয়ে কেমন যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। বয়স্ক মানুষ, লাফ-ঝাপ দিয়ে অভ্যাস নেই। মনে হল পড়ে গিয়ে খুব ভাল মত একটা চোট খেলেন, উঠে দাঁড়াতে তাঁর একটু অসুবিধা হল, শেষ পর্যন্ত যখন উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি বুঝতে পারলাম, আমার বেঁচে থাকার আর কোন সম্ভাবনাই নেই। বাবা এখন সত্যি সত্যি আমাকে মেরে ফেলবেন। মরে যাওয়ার সময় নাকি পুরো জীবনের স্মৃতি চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়। একটু পরেই আমি দেখব সেটা সত্যি কি না!

বাবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে এদিকে সেদিকে তাকালেন। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকে মাছ কাটার বটিটা নিয়ে বের হয়ে এলেন। তাঁর চোখ ধক ধক করছে। হাতে একটা বটি। কি ভয়ংকর একটা দৃশ্য! আমার রক্ত একেবারে হিম হয়ে গেল।

রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে বাবা বটিটা উপরে তুলে ফ্যাসফ্যাসে এক রকমের গলায় বললেন, হারামজাদা, তুই যদি এক পা নড়িস তোকে খুন করে ফেলব। একেবারে খুন করে ফেলব জানোয়ারের বাচ্চা—

বটিটা আমার দিকে ছুঁড়ে মারবেন কিনা জানি না কিন্তু সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা

করার সময় নেই। বাবা ডান হাতে ধরে বটিটা মাথার উপরে তুলে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছেন। এক লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করা যায় কিন্তু সত্যি যদি কোপ মেরে বসেন?

বাবা নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার দুই পা এগিয়ে এলেন। আমি তাঁর হাতের দিকে তাকিয়ে আছি। সত্যি কি আমাকে কোপ মেরে বসবেন? খবরের কাগজে তো দেখি মাঝে মাঝে বাবা ছেলেকে কিংবা ছেলে বাবাকে মেরে ফেলেছে। ব্যাপারগুলি এভাবেই হয় তাহলে!

বাবা তখন আরো দুই পা এগিয়ে এলেন। আমি তখন মরীয়া হয়ে আরো একটা সাহসের কাজ করে ফেললাম। চিৎকার করে বললাম, সবাইকে বলে দিব আমি। সবাইকে —

কি বলবি? বাবা হুংকার দিয়ে বললেন, কি বলবি শুওরের বাচ্চা?

আপনি ওষুধ চুরি করেন। ভেজাল ওষুধ বিক্রি করেন। আমার কাছে প্রমাণ আছে।

বাবা এক সেকেন্ডের জন্যে কেমন জানি হকচকিয়ে গেলেন। তাঁর চোখ হঠাৎ ঘোলাটে হয়ে গেল, শরীর কাঁপতে লাগল, মুখ হা হয়ে গেল এবং সেই অবস্থায় মুখে আঁ আঁ শব্দ করে বটিটা নিয়ে ছুটে এসে আমাকে কোপ মেরে বসলেন। আমি শেষ মুহূর্তে লাফ মেরে সরে গেলাম বলে আমার গায়ে লাগল না, বটিটা পিছনের কাঠের দরজায় গেঁথে গেল ইঞ্চিখানেক।

বাবা সেটা টেনে বের করার চেষ্টা করতে লাগলেন আর হঠাৎ করে আমার ভিতর থেকে সব ভয় চলে গেল। হঠাৎ করে আমার মনে হল, আমি বুঝি অনেক বড় হয়ে গেছি। আমি কেমন জানি হতবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই মানুষটা আমার নিজের বাবা। আমাকে কুপিয়ে মেরে ফেলতে চাইছে? আমার নিজের বাবা!

গভীর কেমন একটা দুঃখে হঠাৎ আমার বুকটা কেমন জানি হু হু করে উঠে।

মা তখন হঠাৎ চিলের মত চিৎকার করে ছুটে এসে বাবাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন, কি সব বলতে লাগলেন আমি তার কিছু বুঝতে পারলাম না। লাবলুটাও ছুটে এসে চিৎকার করে আমার হাত ধরে কাঁদতে শুরু করল। বাবা তখনো মায়ের হাত থেকে ছুটে আসতে চেষ্টা করছিলেন কিন্তু মা শক্ত করে ধরে রাখলেন। বাবা সেই অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে আমার দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, বের হয়ে যা। শুওরের বাচ্চা, বের হয়ে যা তুই বাসা থেকে—

আমি সোজাসুজি বাবার চোখের দিকে তাকালাম, আর কি আশ্চর্য! বাবা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না, চোখ সরিয়ে নিলেন। সেইভাবে চিৎকার করে বললেন, বের হয়ে যা—এই মুহূর্তে বের হয়ে যা —

আমি আর কোন কথা বললাম না। ঠিক সেইভাবে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। মা চিৎকার করে কি যেন বলছেন, লাবলুটা কাঁদছে কিন্তু কিছুই আমার কানে আসছিল না।

কিছুই না।

১১. একা একা

আমি রাস্তা ধরে হাঁটছি। ভাগ্যিস অন্ধকার হয়ে গেছে, তাই আমি যে হু হু করে কাঁদছি সেটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। প্রথম ঘণ্টাখানেক আমি কোথায় কোথায় হেঁটেছি নিজেও জানি না। শুধু মনে হচ্ছিল — বেঁচে থেকে কি হবে? মরে যাই না কেন? এক-দুই বার যখন রাস্তা দিয়ে একটা ট্রাক বা বাস গিয়েছে, মনে হচ্ছিল, লাফিয়ে পড়ে যাই সেগুলির সামনে। ঘণ্টাখানেক পর আমার মন একটু শান্ত হল। আমি তখন স্কুলের দেয়ালে পা ঝুলিয়ে বসে রইলাম। যেখানে বসেছি জায়গাটা একটু অন্ধকার, লোকজন আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না। একজন দুইজন হঠাৎ হঠাৎ দেখে একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল কিন্তু আমি গা করলাম না। কোন কিছুতেই এখন আর কিছু আসে যায় না।

বাবা আমাকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছেন, আমি আর কোনদিন বাসায় ফিরে যাব না। পৃথিবীতে কত বাচ্চাই তো আছে যাদের বাবা নেই, মা নেই, একা একা জীবন কাটিয়ে দেয়। আমি সেভাবে জীবন কাটিয়ে দেব। জুতা পালিশ করে ফেরিওয়ালা হয়ে মিস্তির কাজ করে কোন না কোনভাবে বেঁচে থাকব। সবাই যে পড়ালেখা করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে সেটা তো সত্যি নয়। কাউকে কাউকে কুলি মজুর, রিকশাওয়ালা তো হতে হবে। তাই হব আমি। ট্রেনে করে চলে যাব যতদূর যাওয়া যায়। দূরে কোন শহরে, অজানা কোন গ্রামে। অসুখ-বিসুখ হয়ে মরে গেলে তো ভালই। চুপচাপ কোন গাছের নিচে শুয়ে মরে যাব আমি। আমার কথা আর কে ভাববে! গভীর দুঃখে আমার চোখে পানি এসে গেল হঠাৎ।

আরো যখন রাত হল তখন হঠাৎ করে মশা কামড়াতে শুরু করল। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। কোথায় যাওয়া যায় চিন্তা করছিলাম, প্রথমে ভাবলাম, রেল স্টেশনে গিয়ে শুয়ে থাকি। কত গরিব মানুষ শুয়ে থাকে ঠাণ্ডা মেঝেতে, আর একজন বেশি হলে ক্ষতি কি?

ঠিক তখন আমার জারুল চৌধুরীর গাছঘরের কথা মনে পড়ল! কি আশ্চর্য, সবচেয়ে প্রথমেই তো আমার গাছঘরের কথা মনে পড়ার কথা ছিল। রাগে দুঃখে অভিমানে মাথাটা গরম হয়ে আছে বলে এতক্ষণ মনে পড়েনি। হঠাৎ করে আমি আমার বুকের ভিতর কেমন জানি একটা বল অনুভব করতে থাকি। আমি যতদিন ইচ্ছা গাছঘরে থাকতে পারি। আমার আর ভয় কি?

রাত তখন কয়টা বাজে আমি জানি না। আমি সেটা নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না। তখন তখনই স্কুলের দেয়াল থেকে নেমে নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। অনেকটুকু

রাস্তা, সলীলের সাথে গল্প করতে করতে হেঁটে গেছি বলে আগে কখনো টের পাইনি। দিনের বেলা রাস্তাটা কত পরিচিত মনে হয়, এখন রাত্রিবেলা সবকিছু কেমন বিচিত্র মনে হচ্ছে। গাছগুলিকে মনে হয় মানুষ, ঝোপগুলিকে মনে হয় কোন ধরনের জন্তু জানোয়ার, আর হঠাৎ হঠাৎ করে যখন রাস্তার পাশে থেকে কুকুর বিড়াল কিছু একটা বের হয়ে আসে, আমি এত জোরে চমকে উঠি যে, সেটা আর বলার মত নয়! অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে আমার কত কি মনে হয়! কেমন জানি এক ধরনের অভিমান হতে থাকে। কার উপরে অভিমান কে জানে! চোখে পানি এসে যায় একটু পরে পরে।

জারুল চৌধুরীর বাসায় গিয়ে দেখি পুরোটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কে জানে বাসায় নেই নাকি ঘুমিয়ে গেছেন। কত রাত হয়েছে জানি না, কিন্তু জারুল চৌধুরী বলেছেন তিনি নাকি অনেক রাত জেগে বই পড়েন। হয়তো বাসায় নেই, ঢাকা চলে গেছেন। এই অন্ধকারে বিজন বনে আমি একা চিন্তা করেই আমার কেমন জানি ভয় ভয় করতে থাকে।

আমি অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে গাছঘরের নিচে এসে সাবধানে গাছের ফোকড়ে হাত দিতেই সত্যি সত্যি ছোট একটা প্লাস্টিকের কৌটা পেলাম। এর মাঝে গাছঘরের চাবিটা। সেটা হাতে নিয়ে আমি হাতড়ে হাতড়ে ঝুলে থাকা দড়িটা বের করে একটা হ্যাঁচকা টান দিলাম, সাথে সাথে উপর থেকে দড়ির মইটা ঝপাং করে এসে নিচে পড়ল। জারুল চৌধুরী গাছঘর নিয়ে যা যা বলেছিলেন সত্যি সত্যি তাই করেছেন! আমি সাবধানে মই বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। অন্ধকারে চাবি দিয়ে দরজায় লাগানো তালাটা খুলতে বেশ কষ্ট হল, শেষ পর্যন্ত সেটা খুলে আমি মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকলাম। বাম পাশে তাকের মাঝে একটা ম্যাচ আর মোমবাতি থাকার কথা। সত্যি সত্যি সেটা পেয়ে গেলাম। মোমবাতিটা জ্বালাতেই ভিতরে কেমন জানি এক ধরনের স্বস্তি আর নিরাপদের ভাব চলে এল। আমি মইটা টেনে তুলে দরজাটা বন্ধ করে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম।

গাছের উপর ছোট পুতুলের ঘরের মত একটা ঘর, তার মাঝে গভীর রাতে আমি একা একা বসে আছি। পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করেই আমার কি বিচিত্র লাগতে থাকে! আমি গাছঘরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তাকালাম। ছোট ছোট তাক, তার মাঝে বইপত্র কাগজ কলম। ছোট ছোট টিন, খুলে দেখি সেগুলিতে চিড়া মুড়ি আর গুড়। একটা পানির বোতল, কবেকার পানি কে জানে। দেয়ালে একটা টর্চলাইট, একটা চাকু আর একটা দড়ি ঝুলছে। ঘরের এক কোণায় ছোট একটা তোষকের মত জিনিস গুটানো, এটা নিশ্চয়ই স্লিপিং ব্যাগ হবে। আমি স্লিপিং ব্যাগটা খুলে ফেললাম। সত্যিই চমৎকার একটা বিছানা, ভিতরে ঢুকে গেলে একই সাথে তোষক এবং লেপ হয়ে যায়! বালিশ নেই, কিন্তু বালিশ না হলে আর ক্ষতি কি? কোথায় জানি পড়েছিলাম বালিশ ছাড়া ঘুমানো নাকি স্বাস্থ্যকর!

আমি কয়েক মুঠি চিড়া খেয়ে স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে ঢুকে গেলাম। ভিতরে কি

চমৎকার কুসুম কুসুম গরম! আরামে আমার চোখ বন্ধ হয়ে এল। আমি ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলাম। সাথে সাথে গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গেল।

জায়গাটা কি আশ্চর্য নির্জন সুনসান। হঠাৎ হঠাৎ রাতের পাখি ডেকে উঠে, ডানা ঝাপটায়। মাঝে মাঝে নিশাচর কোন একটা প্রাণী ছুটে যায়, কে জানে কি রকম প্রাণী। এ ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই।

আমি চুপচাপ শুয়ে থাকি। আমার বাবার কথা মনে পড়ে, মায়ের কথা মনে পড়ে, লাবলুর কথা মনে পড়ে। কে জানে লাবলুর জ্বরটা কমেছে কিনা। শুয়ে শুয়ে আমার মনে হতে থাকে কোন দিন বুঝি ঘুম আসবে না। কিন্তু একসময় সত্যি সত্যি আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাতে খুব ভাল ঘুম হল না, হবে আমি সে রকম আশাও করিনি। একটু পরে পরে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল আর আমি চমকে চমকে উঠছিলাম। শেষরাতের দিকে অবিশ্যি আমি বেশ ভালভাবেই ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। প্রথমে বুঝতে পারলাম না আমি কোথায়, হঠাৎ করে আমার সব কথা মনে পড়ল আর মনটা এত খারাপ হল যে, বলার নয়। আমি উঠে বসে জানালাটা খুলে বাইরে তাকালাম, আবছা আলো হয়ে আছে। কি সুন্দর লাগছে চারিদিকে! আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ভোরবেলা খুব চমৎকার একটা ব্যাপার। মানুষের মন এমনিতেই তখন ভাল হয়ে যায়। পৃথিবীতে এত যে খারাপ মানুষ আছে আর এত যে খুনখারাপী, চুরি ডাকাতি হয়, আমি একেবারে বাজি ধরে বলতে পারি এরকম ভোরবেলায় কখনো কোথাও কোন খারাপ কাজ হয় না। কিছুক্ষণের জন্যে পৃথিবীর সব মানুষ ভাল হয়ে যায়।

একটু বেলা হলে আমি জারুল চৌধুরীর সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখি তাঁর দরজায় এই এত বড় একটা তালা ঝুলছে। জারুল চৌধুরী এমনিতে নিজের দরজায় কোন তালা লাগান না, নিশ্চয়ই কয়েকদিনের জন্যে অন্য কোথাও গেছেন। আমার একটু মন খারাপ হল, কারো সাথে কথা বলার জন্যে আমার বুকটা একেবারে হাঁশফাশ করছে।

জারুল চৌধুরীকে না দেখে আমি ভাবলাম সলীলের বাসায় যাই, কিন্তু আজ স্কুল খোলা, সে নিশ্চয়ই স্কুলে যাবে। আমার বইপত্র খাতা কলম কিছু নেই, স্কুলে যাবার কোন প্রশ্নই আসে না। কি করব বুঝতে না পেরে আমি হাঁটতে বের হলাম। আমি সবসময়ই গ্রামের বেশ কাছাকাছি থেকেছি কিন্তু গ্রামটা কখনোই খুব ভাল করে দেখা হয়নি। আজকে হয়তো একটু ঘুরে ঘুরে দেখতে পারব।

হাঁটতে হাঁটতে আমি বেশ কিছু জিনিস আবিষ্কার করলাম। গ্রামে অনেক বাচ্চা আছে যারা কখনোই স্কুলে যায় না। স্কুলে না গিয়ে তারা যে খেলাধুলা করে বেড়াচ্ছে সেটা সত্যি নয়। সবাই কোন না কাজ করছে। অনেকে গরু মাঠে নিয়ে যাচ্ছে, অনেকে ক্ষেতে নিড়ানি দিচ্ছে, অনেকে ঘাস কাটছে, আবার অনেকে মাছ ধরছে। নদীর ধারে একটা ডোবার পাশে অনেকগুলি বাচ্চা মিলে মাছ ধরছিল। প্রথমে কাদামাটি দিয়ে একটা ছোট অংশ আলাদা করে গামলা দিয়ে পানি সেঁচতে শুরু করল। পানি যখন কমে

এল তখন দেখি অনেক রকম মাছ সেখানে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। বাচ্চাগুলি হাতড়ে হাতড়ে সেগুলি ধরতে লাগল। আমি খুব অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম দেখে একজন বলল, মাছ ধরতে চাও?

আমি মাথা নাড়তেই সে বলল, আস তাহলে ধর!

আমি শার্টের হাতা গুটিয়ে মাছ ধরতে শুরু করলাম। ব্যাপারটা দেখতে যত সহজ মনে হয় আসলে মোটেও তত সহজ নয়। হাত থেকে পিছলে পিছলে বের হয়ে যায়। আমার মাছ ধরা দেখে বাচ্চাগুলি হেসেই বাঁচে না। মাছ ধরার মাঝে যে কোন বিপদ থাকতে পারে আমার একবারও মনে হয়নি, কিন্তু হঠাৎ একটা শিং মাছ বুড়ো আঙুলে ঘাঁই মেরে বসল। আমি চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালাম। একজন জিজ্ঞেস করল, শিং মাছ মেরেছে?

আমি মাথা নাড়লাম, বুড়ো আঙুল থেকে রক্ত বের হয়ে গেছে। ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, শিং মাছ বড় খচ্চর, ঠিক করে ধরতে হয় উপর থেকে চেপে, না হলে ঘাঁই মেরে দেয়। অনেক ব্যথা করবে এখন।

সত্যি সত্যি অনেক ব্যথা শুরু হয়ে গেল। ছোট মতন একটা বাচ্চা বলল, আঙুলের মাঝে পেশাব কর, ব্যথা কমবে।

আমি প্রথমে ভাবলাম ছেলেটা আমার সাথে ফাজলেমি করছে, কিন্তু দেখলাম অন্য সবাই মাথা নাড়ল, ফাজলেমি নয়, এটা চিকিৎসা। এরকম চিকিৎসায় আমার বেশি ভরসা নেই, আমি হাত ধুয়ে উঠে এলাম। যখন চলে আসছিলাম একজন বলল, তোমার মাছগুলি নিয়ে যাও।

আমি বললাম, আমার লাগবে না! তোমরা নিয়ে নাও।

দেখতে দেখতে আঙুলটা ফুলে উঠল। আমি হেঁটে হেঁটে ফিরে এলাম। জারুল চৌধুরী এখনো ফিরে আসেননি। আমি খানিকক্ষণ বারান্দায় বসে থেকে আবার গাছঘরে ফিরে গেলাম। মনটা এত খারাপ হয়ে আছে যে, বলার নয়। খুব খিদে পেয়েছে কিন্তু শুকনো চিড়া চিবিয়ে খাওয়ার ইচ্ছে করল না। আমি গাছঘরের মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে রইলাম। পেটে খিদে, হাতে ব্যথা। মনটা খুব খারাপ। কেন জানি শুধু লাবলুর কথা মনে হচ্ছে। আমি শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ কাঁদলাম, তারপর মনে হয় একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি খুব বিচিত্র একটা স্বপ্ন দেখলাম। আমি একটা নদীর উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। নদীর পানি কুচকুচে কাল। সেই পানির নিচে লম্বা লম্বা শুঁড়ের অক্টোপাস। সেগুলি আমাকে ধরতে আসছে আর আমি তার মাঝে হেঁটে যাচ্ছি। হঠাৎ আমাকে কে যেন ডাকল, মুনীর!

আমি তাকিয়ে দেখি, বাবা। বাবার হাতে একটা বন্দুক। বাবা বন্দুকটা আমার দিকে তাক করে ধরে আবার ডাকলেন, মুনীর!

আমি ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করলাম, তখন বাবাও আমার পিছনে পিছনে ছুটতে

লাগলেন। কিন্তু আমি যেরকম পানির উপর দিয়ে দৌড়াতে পারি, বাবা পারেন না। পানিতে পা দিতেই বাবা ডুবে গেলেন আর সবগুলি অক্টোপাস এসে বাবাকে প্যাঁচিয়ে ধরল। বাবা তখন চিৎকার করতে লাগলেন, মুনীর মুনীর মুনীর

আর ঠিক তখন আমার ঘুম ভেঙে গেল, শুনি সত্যিই কে যেন আমাকে ডাকছে, মুনীর, এই মুনীর।

আমি চোখ খুলে দেখি সলীল। আমার মুখের উপর উবু হয়ে বসে আছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম, বললাম, সলীল! তুই?

সলীল দাঁত বের করে হেসে বলল, আমি ঠিক ভেবেছি তুই এখানে থাকবি! ঠিক ভেবেছি।

আমার তখনো চোখে ঘুমের ঘোর, চোখ কচলে বললাম, কেমন করে বুঝলি?

না বোঝার কি আছে? সলীল হাতে কিল দিয়ে বলল, তুই যদি বাড়ি থেকে পালাস তাহলে আর কোথায় যাবি?

আমি বাড়ি থেকে পালাইনি, বাবা বের করে দিয়েছে।

ঐ একই কথা!

মোটেও এক কথা না। বাবাকে তুই চিনিস না। আরেকটু হলে বটি দিয়ে কুপিয়ে খুন করে ফেলত।

সলীল কিছু বলল না, আমিও আর সেটা নিয়ে কিছু বললাম না। সলীলকে দেখে এত ভাল লাগছে যে, বলার নয়। ইচ্ছে হচ্ছিল একেবারে জড়িয়ে ধরি কিন্তু হাজার হলেও বড় হয়ে যাচ্ছি, কাজেই আর জড়িয়ে ধরলাম না, কিন্তু মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, সলীল হবে আমার সারা জীবনের প্রাণের বন্ধু। যেরকম বন্ধুর জন্যে মানুষ জান দিয়ে দেয় সেরকম বন্ধু।

সলীলের হাতে একটা ঠোঙা, আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নে খা।

কি?

তোর জন্যে পরটা মাংস এনেছি!

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, সত্যি? খোদার কসম?

ধুর গাধা, এইজন্যে আবার খোদার কসম বলতে হয়?

আমি তাড়াতাড়ি ঠোঙাটা খুলে দেখি সত্যিই খবরের কাগজে মোড়া বড় বড় দুইটা পরটা ভিতরে মাংস দিয়ে প্যাচিয়ে এনেছে। আরেকটা ছোট ঠোঙায় দুইটা লাড্ডু। সাথে বড় বড় দুইটা কলা। খাবারগুলি দেখে আমার একেবারে জিবে পানি এসে গেল।

সলীল বলল, আমি বুঝেছিলাম তোর নিশ্চয়ই খাওয়া হয়নি। সুবলের রেস্টুরেন্ট থেকে কিনে এনেছি। দ্যাখ খেয়ে, মনে হয় এখনো গরম আছে।

কেন জানি হঠাৎ আমার চোখে পানি এসে গেল। খুব সাবধানে আমি চোখের পানি মুছে ফেললাম। সলীল না দেখার ভান করে দূরে তাকিয়ে রইল।

আমি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, তুই কেমন করে খবর পেলি?

এরকম খবর কি চাপা থাকে নাকি? তুই রাগ করে বাসা থেকে পালিয়ে গেছিস, লোকজন সেটা জানবে না? আমি গিয়েছিলাম তোদের বাসায়।

সত্যি? গিয়েছিলি?

হ্যাঁ।

কি দেখলি?

মাসীমা খুব কান্নাকাটি করছেন।

আর লাবলু? জ্বর কমেছে?

জ্বর ছিল নাকি? দেখে তো মনে হল না। লাবলু কাঁদছে না তবে খুব গম্ভীর।

আমি বাবার কথা জিজ্ঞেস করলাম না, সলীল নিজেই বলল, তোর বাবা খালি লাফ ঝাঁপ দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

তাই?

হ্যাঁ। বলছেন দুইদিন যখন না খেয়ে থাকবি তারপরেই নাকি সুড়সুড় করে ফেরৎ যাবি।

তাই বলছেন?

হ্যাঁ। সলীল মাথা নাড়ল, তুই যখন ফিরে যাবি তখন নাকি তোকে আচ্ছামত ধোলাই দেওয়া হবে।

আমি আর কিছু বললাম না।

সলীলের সাথে আরো নানারকম কথা হল, আমি তাকে শিং মাছের থাই খাওয়ার কথা বললাম, তার বিচিত্র চিকিৎসার কথা শুনে সে হেসেই বাঁচে না। জারুল চৌধুরী কোথায় যেতে পারেন সেটা নিয়েও কথা হল। রাত্রে কেমন ঘুম হয়েছে, একা একা ভয় পেয়েছি কিনা সলীল সেগুলিও খুব খুটিয়ে খুটিয়ে জানতে চাইল। সন্ধ্যে হয়ে এলে যখন সলীলের বাসায় চলে যাবার সময় হল, হঠাৎ করে সে বলল, তোদের বাসার কাছে আরো একজন পালিয়ে গেছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কে?

তোদের বাড়িওয়ালা উকিল সাহেবের বাসায় গরু রাখে যে ছেলেটা—

জয়নাল?

হ্যাঁ, জয়নাল।

জয়নালের কি হয়েছে?

বাসা থেকে পালিয়ে গেছে। গরু বাছুর ছেড়ে দিয়েছে, সেই গরু বাছুর নাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে, জয়নালের দেখা নেই।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হতেই পারে না।

হতে পারে। সলীল হাসার মত ভঙ্গি করে বলল, আমি নিজের চোখে দেখেছি। তোদের উকিল সাহেব এই এত বড় একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জয়নালকে ধরে আনা হলেই এক ঘা মেরে মাথা দুইভাগ করে দেবেন।

আমি অবাক হয়ে বসে রইলাম। মাত্র সেদিন আমি জয়নালের চিঠি লিখে দিয়েছি। লম্বা চিঠি। সেখানে কাজ ছেড়ে দেওয়ার কোন উল্লেখ নেই। হঠাৎ করে আমার একটা কথা মনে হল। আমি চমকে উঠে বললাম, সর্বনাশ!

সলীল অবাক হয়ে বলল, কি হয়েছে?

নাওয়াজ খান!

নাওয়াজ খান কি?

নাওয়াজ খান নিশ্চয়ই জয়নালকে আটকে রেখেছে! নিশ্চয়ই খুন করে ফেলবে।

কি বলিস তুই?

হ্যাঁ। তার আরেক বন্ধু ছিল যে নাওয়াজ খানের কাছে যেতো, কয়দিন আগে খুন হয়েছে, মনে নেই?

হ্যাঁ, তুই বলেছিলি।

আরো অন্যেরা নিখোঁজ হয়ে গেছে, কোন খোঁজ নেই। এখন জয়নালের কোন খোঁজ নেই! তুই বুঝতে পারছিস না?

সলীল ভুরু কুঁচকে বলল, তুই বলছিস জয়নাল খুন হয়ে গেছে?

আল্লাহ্ না করুক! কিন্তু—

কিন্তু কি?

জয়নালকে আমি চিনি, সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে সে কোনদিন বাসা থেকে পালাবে না। নিশ্চয়ই তার কোন বিপদ হয়েছে। নিশ্চয়ই—

সলীল মুখ সূচালো করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুই ঠিকই বলেছিস। নাওয়াজ খান খুব ডেঞ্জারাস মানুষ।

কি করা যায় বল্ তো?

সলীল খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের যেতে হবে তাকে বাঁচানোর জন্যে।

আমরা?

হ্যাঁ, কাউকে বলে লাভ নেই, কেউ আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না।

ঠিকই বলেছিস। আমি মাথা নেড়ে বললাম, চল যাই তাহলে। দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ঠিক রওনা দেওয়ার আগে সলীল বলল, চল জারুল চৌধুরীকে একটা চিঠি লিখে যাই, কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি বলে। আমাদের যদি কিছু একটা হয় তাহলে অন্ততঃ কেউ একজন জানবে!

সলীল খুব সুন্দর বাংলা লিখতে পারে, খুব গুছিয়ে একটা চিঠি লিখে ফেলল। চিঠিটা তাঁর দরজায় লাগিয়ে আমরা বের হয়ে এলাম। বাইরে তখন অন্ধকার নেমে আসছে।

১২. গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিক

আমার যখন গ্রীন মেডিকেল ক্লিনিকের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার হয়ে এসেছে, রাস্তাঘাটে মানুষ বেশি নেই। আমরা দোতালা দালানটার দিকে তাকালাম, উপরে দুটি ঘরে বাতি জ্বলছে, এ ছাড়া পুরো ক্লিনিকটা অন্ধকার। সামনে বড় গেটটা বন্ধ, আমরা তবু সাবধানে একটু ধাক্কা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। হেঁটে হেঁটে আমরা ক্লিনিকের পিছনে গেলাম, সেটাও দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। পিছনেও একটা ছোট কাঠের গেট, সেই গেটটাও বন্ধ। আমরা দেওয়ালের উপর দিয়ে ভিতরে তাকালাম। কোন মানুষজন নেই, দেখে মনে হয় এখানে কোন মানুষজন থাকে না। আমি গলা নামিয়ে বললাম, ভিতরে ঢুকতে হবে আমাদের।

কেমন করে ঢুকবি?

দেওয়াল টপকে।

যদি ধরা পড়ে যাই?

কার কাছে ধরা পড়বি? কাউকে তো দেখি না।

তা ঠিক।

এদিক সেদিক তাকিয়ে আমার দুইজন সাবধানে দেওয়াল বেয়ে উঠে ভিতরে লাফিয়ে পড়লাম। তাড়াহুড়ো করে ঢুকতে গিয়ে পেটের খানিকটা ছাল উঠে গেল কিন্তু এখন সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। চোর যখন কোথাও চুরি করতে আসে, প্রথমেই নাকি পালিয়ে যাওয়ার রাস্তাটা ঠিক করে নেয়। আমরাও আজকে চোরের মতই ঢুকেছি, পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা ঠিক করতে গিয়ে দেখি, কাঠের ছোট গেটটাতে একটা ছোট তালা লাগানো। দৌড়ে যদি পালাতে হয় কাজটা খুব সহজ হবে না। আপাততঃ চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে দিলাম, এখন খামাখা এটা নিয়ে চিন্তা করে কি লাভ?

আমরা খুব সাবধানে গুড়ি মেরে দোতলা বাসাটার কাছে এলাম। পেছনে একটা দরজা, আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে দেখি ভিতর থেকে বন্ধ। সামনেও একটা দরজা, সেটাও নিশ্চয়ই বন্ধ। আমরা তবু সাবধানে পরীক্ষা করে দেখলাম। আমরা উপরের দিকে তাকালাম, উপরে কয়েকটা জানালা রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটা জানালাতেই লোহার শিক লাগানো। পানির পাইপ বেয়ে একটা কার্নিশে ওঠা যায় কিন্তু সেখান থেকে অন্য কোথাও যাবার সহজ কোন উপায় নেই। আমরা দুজন দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে নানা রকম পরিকল্পনা করতে থাকি। অনেক ভেবে চিন্তে যে পরিকল্পনাটা দাঁড় করালাম সেটা ভয়ংকর বিপজ্জনক, কিন্তু মনে হল এটা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। দুজনে মিলে পরিকল্পনাটা বেশ কয়েকবার যাচাই করে দেখলাম। যদি কোন গোলমাল হয়ে যায় তখন কি করতে হবে সেটাও মোটামুটি ঠিক করে নেয়া হল। পরিকল্পনায় একজন দরজাটা খোলার ব্যবস্থা করাবে, অন্যজন গোপনে ভিতরে

ঢুকে যাবে। যে দরজাটা খোলার ব্যবস্থা করবে তার ছোটাছুটি করতে হবে বলে সেটা সলীলকে দেয়া হল। শিং মাছের ঘাঁই খেয়ে এখনো বুড়ো আঙুলটা টন টন করছে, যদি টানা হ্যাচড়া করে দেওয়াল বেয়ে উঠতে হয়, সলীল সেটা আমার থেকে ভাল করতে পারবে।

আমি দরজার কাছাকাছি একটা ঝোপের নিচে লুকিয়ে গেলাম। সলীল বড় বড় কয়টা ঢেলা নিয়ে কাঠের গেটটার উপরে পা ঝুলিয়ে বসে, একটা দরজায় ছুঁড়ে মারল বেশ শব্দ করেই। সাথে সাথে ভিতর থেকে নাওয়াজ খানের ড্রাইভারের গলা শুনতে পেলাম, চিৎকার দিয়ে বলল, কে?

সলীল গেটের উপরে বসে বলল, আমি।

আমি কে?

সলীল উত্তর না দিয়ে আরেকটা ঢিল ছুঁড়ে মারল দরজায়।

ওসমান সাথে সাথে দরজা খুলে মাথা বের করে ধমক দিয়ে বলল, কে দরজায় শব্দ করছে? কে?

বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে, তার উপর টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সলীল যে গেটের উপরে বাস আছে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। সে গেটের উপর থেকে চিৎকার করে বলল, আমি! এই যে আমি! এইখানে।

ওসমান যতটুকু রেগে উঠল মনে হল তার থেকেও বেশি অবাক হল। দরজা খুলে বাইরে এসে বলল, পাজী ছেলে! দরজায় ঢিল ছুঁড়ছ কেন?

সলীল গেটের উপর থেকে বলল, হাতের ব্যায়াম করছি। ঢিল ছোঁড়া হাতের খুব ভাল ব্যায়াম, জানেন তো।

কি বললি? কি বলছিস তুই বদমাইশ?

তুই তোকারি করছেন কেন? আমি কি আপনার চাঁদীতে ঢিল মেরেছি? হ্যাঁ?

ওসমান কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, ভাগ এখান থেকে। ভাগ।

সলীল একটা ঢিল হাতে নিয়ে বলল, আপনার কি মনে হয়, এখান থেকে ঢিল ছুঁড়ে কি দোতলার জানালার কাঁচটা ভাঙতে পারব?

কি? কি বললি?

মনে হয় পারব। এই দেখেন—ওসমান কিছু বলার আগেই জানালার দিকে একটা বড় ঢিল ছুঁড়ে দেয়। অল্পের জন্যে সেটা কাঁচে না লেগে কার্নিশে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ওসমান নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। সলীল তখন আরেকটা ঢিল হাতে নিয়েছে, সেটা জানালার দিকে নিশানা করে বলল, এইটা নিশ্চয়ই পারব! ওয়ান টু—

সলীল ঢিলটা ছোঁড়ার আগেই ওসমান রেগে আগুন হয়ে গেটের দিকে ছুটে যেতে থাকে। আমি ঠিক এই সুযোগের জন্যে আপেক্ষা করছিলাম, খোলা দরজা দিয়ে হুট

করে ভিতরে ঢুকে গেলাম। এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখি একটা ছোট টেবিল। টেবিলক্লথ দিয়ে ঢাকা। আমি দৌড়ে সেই টেবিলের নিচে লুকিয়ে গেলাম।

বাইরে কি হচ্ছে বুঝতে পারছিলাম না। সলীল নিশ্চয়ই লাফিয়ে গেট থেকে নেমে যাবে, তাকে কখনোই ধরতে পারবে না। যতক্ষণ পারা যায় ওসমানকে বাইরে ব্যস্ত রাখার কথা। মনে হয় সলীল সেটাই চেষ্টা করছে। সলীল কিছু একটা বলছে এবং ওসমান প্রচণ্ড গালি-গালাজ করছে শুনতে পেলাম। পরিকল্পনার প্রথম অংশটা মনে হয় ভালভাবেই কাজ করেছে।

আমি টেবিলের নিচে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছি এর মাঝে একটু পরে শুনতে পেলাম ওসমান ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল, তারপর গজগজ করে কি একটা বলতে বলতে উপরে উঠে গেল। উপর থেকে ভারি গলায় নাওয়াজ খান জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে ওসমান?

আর বলবেন না স্যার! এক বদমাইশ ছেলে খামাখা গেটের উপরে বসে ঢিল ছুঁড়ছে!

হুম্‌ম। নাওয়াজ খান অবাক হয়ে বলল, কেন? ঢিল ছুঁড়ছে কেন?

বদমাইশী স্যার। পোলাপান যে কি বদমাইশ হয় আপনি জানেন না স্যার।

জানি। আমি জানি। কিন্তু এইটা কি বদমাইশী না অন্য কিছু?

অন্য কিছু কি?

নাওয়াজ খান ভারি গলায় বললেন, কোন কিছু সন্দেহ করছে না তো কেউ?

কি সন্দেহ করবে স্যার?

আমাদের কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের প্রজেক্ট?

আরে না স্যার! আপনি কি বলছেন! কোনদিনও না।

হঠাৎ করে পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সাথে সাথে প্রচণ্ড আতংকে আমাদের সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠে। আমরা যেটা সন্দেহ করেছি সেটা সত্যি!

গরিব বাচ্চাদের নিয়ে নাওয়াজ খান কি করছে বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারলাম। তাদের মেরে শরীর থেকে কিডনিটা কেটে নেয়। অসুখ-বিসুখে মানুষের কিডনি নষ্ট হয়ে যায়, তখন অন্যের কিডনি লাগানো যায়। গরিব বাচ্চাদের কিডনি কেটে নিয়ে এরা বিক্রি করে। কি সর্বনাশা ব্যাপার! রশীদকে নিশ্চয়ই এভাবে মেরেছে। জয়নালকেও এভাবে মারবে। নাকি এর মাঝে মেরে ফেলেছে! এক ভয়ংকর ভয়ে আবার আমার সারা শরীর কেঁপে উঠে।

আমি খুব সাবধানে টেবিলের নিচে থেকে বের হয়ে পিছনের দরজাটি খুলে দিলাম। সলীলের একটু পরে ভিতরে এসে ঢোকার কথা। ভিতরে একজন না হয়ে দুজন হলে অনেক সুবিধে। আমি একবার ভাবলাম, যেটুকু জানবার জেনে গেছি, এখন বের হয়ে যাই, কিন্তু জয়নালের কথা মনে পড়ল। বেচারা কি অবস্থায় আছে না জেনে কেমন

করে যাই? সলীলের জন্যে অপেক্ষা না করে আমি খুব সাবধানে নিচের তলাটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। অন্ধকার ঘর, খুব স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না, কিন্তু মনে হল দেখার মত বিশেষ কিছু নেই। সোফা, চেয়ার টেবিল, শেলফ এই ধরনের জিনিসপত্রই বেশি। জয়নালের কোন চিহ্ন নেই। তাকে মনে হয় দোতলাতে আটকে রেখেছে।

যখন শুনলাম উপরে দুইজন আবার কথা বলতে শুরু করেছে, আমি তখন খুব সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। উপরে অনেকগুলি ঘর, যেই ঘরে নাওয়াজ খান ওসমানের সাথে কথা বলছে খুব সাবধানে সেই ঘরটা এড়িয়ে আমি অন্য ঘরগুলিতে উঁকি দিতে থাকি। প্রথম দুটি ঘরে অনেকগুলি বিছানা সাজানো, হাসপাতালে যেরকম থাকে। তিন নম্বর ঘরটা অন্ধকার মনে হল। ভিতরে নানারকম ডাক্তারি যন্ত্রপাতি। চার নম্বর ঘরটার দরজা বন্ধ, জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি, ভিতরে আবছা অন্ধকার। মনে হল একটা বিছানা কিন্তু বিছানাটি খালি, সেখানে কেউ নেই। আমি পরের ঘরটি দেখার জন্যে সরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল মেঝেতে কেউ যেন শুয়ে আছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, সত্যি তাই। আবছা অন্ধকার, ভাল করে দেখা যায় না, কিন্তু মানুষটি ছোট, নিশ্চয়ই জয়নাল হবে। মরে গেছে কিনা বুঝতে পারছিলাম না, তাই অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। মনে হল এক সময় একটু নড়ে উঠল, তার মানে এখনো বেঁচে আছে। ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু মনে হল হাত দুটি পিছনে বাঁধা, মুখটিও কাপড় দিয়ে আটকানো, যেন কোন রকম শব্দ করতে না পারে। বেচারা জয়নাল! না জানি কতক্ষণ থেকে তাকে এভাবে বেঁধে ফেলে রেখেছে।

আমি সাবধানে উঠতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখন কে যেন আমার ঘাড়ে হাত রাখল। আমি চমকে উঠলাম, ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠছিলাম, অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে মাথা ঘুরিয়ে দেখি, সলীল। আমি বুকে হাত দিয়ে ফিসফিস করে বললাম, সলীল তুই!

হ্যাঁ। সলীল গলা নামিয়ে বলল, জয়নালকে পেয়েছিস?

হ্যাঁ। ঐ দেখ।

সলীল জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে খানিকক্ষণ দেখে বলল, বেঁধে রেখেছে?

হ্যাঁ। মুখও বাঁধা।

কি সর্বনাশ! এখন কি করবি?

বাইরে গিয়ে খবর দিতে হবে। এরা বাচ্চাদের কিডনি কেটে বিক্রি করে।

তুই কেমন করে জানিস?

আমি এদের কথা বলতে শুনেছি।

সর্বনাশ!

হ্যাঁ। চল যাই এখন।

আমাদের কথা যদি কেউ বিশ্বাস না করে?

আমার এই কথাটা আগে মনে হয়নি, সত্যি তো, আমরা বাইরে গিয়ে কাকে

বলব? পুলিশকে? পুলিশ যদি আমাদের ধমক দিয়ে বের করে দেয় তখন? ততক্ষণে যদি জয়নালকে মেরে ফেলে?

সলীল ফিসফিস করে বলল, জয়নালকে ছুটিয়ে নিতে হবে। তারপর এক সাথে তিনজন পালাব।

হ্যাঁ। আমি মাথা নাড়লাম। জয়নালকে নিয়ে পালাতে হবে।

আমি ভিতরে যাই, তুই বাইরে থাক।

উহু! আমি মাথা নাড়লাম, জয়নাল তোকে চিনে না, গোলমাল করতে পারে। আমি যাই।

একটু ভেবে সলীল রাজি হল। বলল, ঠিক আছে, তুই যা। সাবধানে।

সলীল সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, আমি পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম। ভারি একটা দরজা, তার মাঝে শক্ত লোহার ছিটকিনি লাগানো। আমি খুব সাবধানে কোন শব্দ না করে সেই ছিটকিনি খোলার চেষ্টা করলাম, তবু খুট করে একটা শব্দ হয়ে গেল। আমি ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেলাম, কিন্তু কপাল ভাল, নাওয়াজ খান বা ওসমান ঘর থেকে বের হল না। আমি শেষ পর্যন্ত ছিটকিনিটা খুলতে পারলাম। খুব সাবধানে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই জয়নাল ভয় পেয়ে হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করে হাত পা ছুড়ে ছটফট করে উঠল।

আমি ছুটে জয়নালের কাছে গিয়ে কানের কাছে ফিসফিস করে বললাম, চুপ জয়নাল! শব্দ করিস না। আমি মুনীর।

জয়নাল সাথে সাথে চুপ করে যায় কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। আমি শুনতে পেলাম পাশের ঘর থেকে ওসমান আর নাওয়াজ খান ছুটে বের হয়ে আসছে। বাইরে একটা আলো জ্বলে উঠল, সাথে সাথে সলীলের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। নাওয়াজ খান আর ওসমান "ধর ধর" চিৎকার করে তার পিছু পিছু ছুটতে থাকে। আমি কি করব বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি বিছানার নিচে লুকিয়ে গেলাম।

সলীল পালিয়ে যেতে পেরেছে কিনা জানি না, দুই দুইজন বড় মানুষের সাথে কি সে দৌড়ে পারবে? পিছনের গেটটা খোলা থাকলে তবু একটা কথা ছিল। আমি প্রাণপণে খোদাকে ডাকতে থাকি—হে খোদা! সলীল যেন পালিয়ে যেতে পারে। তাকে যেন বদমাইশগুলি ধরতে না পারে। কিছুতেই যেন ধরতে না পারে—

একটু পরেই বুঝতে পারলাম, খোদা আমার দোয়া শুনেনি। আমি ওসমানের গলা শুনতে পেলাম, চাপা স্বরে বলছে, বদমাইশ ছেলে, এইবার আমি তোকে পেয়েছি, দেখ তোর আমি কি অবস্থা করি।

আমি সলীলের গলার স্বর শুনতে পারলাম, ছেড়ে দাও আমাকে, খবরদার।

প্রচণ্ড আতংকে আমার সারা শরীর কেমন যেন অবশ হয়ে আসে। হে খোদা, এটা তুমি কি করলে? এখন কি হবে?

১৩. মুখোমুখি

সলীলকে ধরে নাওয়াজ খান আর ওসমান পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সলীলকে কি করছে আমি জানি না কিন্তু শব্দ শুনে মনে হল দুই একটা ঘুষি কিল মেরে বসেছে। নাওয়াজ খান হঠাৎ বলল, ওসমান, থাম দেখি।

বদমাইশটাকে জানে মেরে ফেলব। আমার সাথে ফাজলেমি।

ঠিক আছে, যখন সময় হবে মেরো, এখন আমাকে একটু কথা বলতে দাও। এই ছেলে, তুমি এখানে এলে কেন?

সলীল কোন কথা বলল না।

তোমাকে আমি আগে দেখেছি। কয়দিন আগে এসেছিলে আমার সাথে দেখা করতে। সাথে আরেকজন ছিল তোমার। ওসমান বলেছে একটু আগে তুমি দরজায় ঢিল ছুঁড়েছ। এখন তুমি ভিতরে ঢুকেছ। ব্যাপারটা কি?

সলীল তখনো কোন কথা বলল না।

কথা বল ছেলে। না হলে তোমার খুব বড় বিপদ হতে পারে।

সলীল মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, কি বিপদ?

আমার মনে হয় না তুমি সেটা শুনতে চাও। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তুমি এখানে কেন এসেছ?

সলীল কোন কথা বলল না।

তুমি কি একা এসেছ না সাথে আর কেউ ছিল?

আমি একা।

তোমার সেই বন্ধু কোথায়?

বাইরে।

বাইরে কেন?

আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি যদি ভিতরে আটকা পড়ি, সে খবর দেবে।

কোথায় খবর দেবে?

আমি বলতে চাই না।

কেন বলতে চাও না?

সলীল কোন কথা বলল না।

নাওয়াজ খান ধমক দিয়ে বলল, সত্যি করে বল তোমার সেই বন্ধু কোথায়?

বাইরে। আমরা এত বোকা না যে দুইজন একসাথে ঢুকব। একজন ভিতরে, আরেকজন বাইরে।

হুম! নাওয়াজ খান অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ভিতরে ঢুকেছ কেমন করে?

বুদ্ধি খাটিয়ে। আমি যখন আপনার ড্রাইভারকে বাগানোর চেষ্টা করছিলাম তখন

সে ঢুকে গেছে। তারপর দরজা খুলে দিয়েছে, তখন আমি ঢুকেছি। সে এখন বাইরে অপেক্ষা করছে।

আমার কি মনে হয় জান?

কি? সে ভিতরে কোথাও আছে। খুঁজলেই পাওয়া যাবে।

খুঁজেন তাহলে। সলীল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমরা এত বোকা না।

তোমরা বোকা না?

না।

তার মানে তোমরা অনেক কিছু জান?

সলীল চুপ করে রইল।

তোমরা জয়নালের কথা জান?

জানি।

কেমন করে জান? তার সাথে তো তোমাদের বন্ধুত্ব হওয়ার কথা না।

জয়নাল আমার বন্ধুর পাশের বাসায় কাজ করে। আমার বন্ধু তার চিঠিপত্র লিখে দেয়। সেই জন্যে তার সাথে পরিচয়।

তুমি জয়নালকে চেনো না?

না।

নাওয়াজ খান মনে হল একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তুমি একটু আগে বলেছ যে তুমি বোকা না। আসলে সেটা সত্যি না। আসলে তুমি বোকা। অসম্ভব বোকা। মানুষ বোকা না হলে একজন মানুষ যাকে চিনে না তার জন্যে নিজের জীবন শেষ করে না। তুমি শেষ করেছ। জয়নালকে কেন এনেছি তুমি মনে হয় জান। সেটা যারা জানে তাদের নিয়ে আমি কোন ঝুঁকি নেই না।

আমার বন্ধু এতক্ষণে পুলিশের কাছে চলে গেছে। এক্ষুনি পুলিশ আসবে।

আমার মনে হয় তুমি মিথ্যা কথা বলছ। তোমাদের মাঝে কোন বড় মানুষ নেই। তোমরা ছোট বাচ্চারা অনেক বড় ব্যাপারে নাক গলিয়েছ। সেটার ফল তোমরা পাবে—

আমার বন্ধু—

তোমার কোন বন্ধু নেই। যদি থেকেও থাকে, তার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। বিশেষ করে যদি আমার বিরুদ্ধে বলে। তাও এরকম উদ্ভট একটা গল্প। কিন্তু আমি তবু কোন ঝুঁকি নেব না। সত্যিই যদি তোমার বন্ধু পুলিশের কাছে যেয়ে থাকে, সত্যিই যদি পুলিশ তার কথা বিশ্বাস করে এখানে আসে, তার জন্যে একটু সময় দরকার। কম করে হলেও এক ঘণ্টা। আমি আধ ঘণ্টার মাঝে সব কাজ শেষ করে ফেলব।

কি কাজ?

সেটা জানতে চেয়ো না ছেলে। তোমার শুনতে ভাল লাগবে না। মেরে ফেলার কথা শুনতে কারো ভাল লাগে না।

সলীল কি একটা বলতে যাচ্ছিল, নাওয়াজ খান তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

ওসমান।

জী।

এই পুরো ঝামেলাটা হল তোমার বোকামির জন্যে। যদি এই ছেলেটা ভিতরে না ঢুকতে পারত এই ঝামেলাটা হত না।

আমি বুঝি নাই স্যার। আমি মনে করেছি—

থাক। আমাদের হাতে সময় নেই। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে। দুইটা কুলার রেডি কর।

দুইটা?

হ্যাঁ। একটাতে জয়নালের কিডনি, আরেকটা বোনাস, এই মাথামোটা ছেলের কিডনি। আর দুইটা বড় প্লাস্টিকের ব্যাগ বের কর। এদের ডেডবডি মনে হয় সাথে নিয়ে যেতে হবে। সত্যিই যদি পুলিশে খবর দিয়ে থাকে, কোন প্রমাণ রাখা ঠিক হবে না। আমি অপারেশান থিয়েটার রেডি করছি, তুমি মাইক্রোবাসটাও রেডি কর। আধ ঘণ্টার মাঝে সব কাজ শেষ করে আমরা রওনা দেব।

ঠিক আছে স্যার। আর এই ছেলেটা?

এখন বেঁধে রাখ। মুখে সার্জিক্যাল টেপ লাগিয়ে দাও যেন শব্দ করতে না পারে।

সলীল আবার কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু মনে হয় বলতে পারল না। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির মত শব্দ হল, তারপর এক সময় আমাদের এই ঘরটাতে সলীলকে ফেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

নাওয়াজ খান আর ওসমানের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই আমি বিছানার নিচ থেকে বের হয়ে সলীলের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, সলীল!

সলীল কোন শব্দ করতে পারল না, মুখ দিয়ে কেমন জানি ঘোঁ ঘোঁ করে শব্দ করল। আমি তার মুখের টেপটা খুলে দিতেই সে ফিসফিস করে বলল, মুনীর, তুই এখানে কি করিস? পালিয়ে গেলি না কেন?

একা একা কোথায় যাব। কি করব? কেউ কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

তাহলে?

দাঁড়া, আগে তোদের তাড়াতাড়ি খুলে দিই। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। আমার তিনজন, তারা দুইজন, আর কিছু যদি না হয় গায়ের জোরে বের হয়ে যাব!

খুব শক্ত করে বেঁধেছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে হাতের বাঁধন খুলতে অনেকক্ষণ সময় লাগল। বাইরে নিচে নাওয়াজ খান আর ওসমানের নানারকম কাজকর্মের শব্দ পাচ্ছিলাম। শুধু ভয় হচ্ছিল, ওদেরকে খুলে দেয়ার আগেই না চলে আসে। কিন্তু এল না। আমি প্রথমে সলীলের এবং পরে সলীল আর আমি মিলে জয়নালের বাঁধন খুলে দিলাম।

জয়নাল তার কব্জিতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, শুওরের বাচ্চাদের জান যদি আমি শেষ না করি!

আমি বললাম, আস্তে জয়নাল, আস্তে—

জয়নাল হিসহিস করে বলল, গলা ছিঁড়ে ফেলব আমি। কলজে টেনে বের করে ফেলব।

আমি আবার বললাম, আস্তে জয়নাল! আস্তে।

জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলব। জন্মের মত লুলা করে দেব।

মাথা গরম করিস না জয়নাল, খুব ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। যখন ওরা ঢুকবে তখন তোরা মেঝেতে শুয়ে থাকিস মুখে টেপ লাগিয়ে, যেন বুঝতে না পারে তোদের হাত খোলা। তারপর যেই কাছে আসবে—

লাফিয়ে পড়ব! জয়নাল দাঁত কিড়মিড় করে বলল, গলা ছিঁড়ে ফেলব।

সলীল একটু ইতঃস্তত করে বলল, খালি হাতে? একটা লাঠিসোটা পেলে হত।

আমরা ঘরে খোঁজাখুজি করতে থাকি, লাঠি জাতীয় কিছু পাওয়া গেল না। পাশে একটা ছোট বাথরুম আছে, সেখানে কয়েকটা বোতল পাওয়া গেল। দড়ি দিয়ে সেগুলো বেঁধে নেয়া হল। ঘুরিয়ে যদি ঠিকমত মারা যায় একজনকে ঘায়েল করতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা না।

সলীল আবার বলল, একটা সিগন্যাল দিতে পারলে হত, ঠিক তখন লাফিয়ে পড়তাম!

আমি বললাম, এক কাজ করলে কি হয়?

কি কাজ?

বাথরুমে একটা লাইট সুইচ আছে।

হ্যাঁ। সলীল ঠিক বুঝতে পারল না, জিজ্ঞেস করল, লাইট সুইচ দিয়ে কি হবে?

যদি লাইট বাল্বটা খুলতে পারি তাহলে সেটার পিছনে একটা পয়সা দিয়ে বাল্বটা আবার লাগিয়ে দিতে পারি। তারপর যেই সুইচ অন করা হবে, ফিউজ কেটে পুরো বাসা অন্ধকার হয়ে যাবে। তারা একেবারে কিছু বুঝতে পারবে না — তোরা তখন অন্ধকারে লাফিয়ে উঠে —

সলীল হাতে কিল দিয়ে বলল, ভেরী গুড!

বাথরুমের লাইট বাল্বটা খোলা খুব সহজ হল না। প্রথমে এক মুহূর্তের জন্যে জ্বালিয়ে দেখে নিলাম সেটা কোথায়, তারপর অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সেটা খুলে ফেললাম। তার জন্যে খুব সাবধানে বেসিনের উপর দাঁড়াতে হল। শুধু মনে হচ্ছিল সবকিছু ভেঙে বুঝি হুড়মুড় করে নিচে পড়ব। বাল্বের পিছনে পয়সা দেয়ার পর বাল্বটা আবার লাগাতে খুব কষ্ট হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা লাগিয়ে ফেললাম। আমাদের প্রস্তুতি এখন শেষ।

সলীল আর জয়নাল তাদের মুখে সার্জিক্যাল টেপটা লাগিয়ে নিয়ে হাত পিছনে করে শুয়ে রইল। দেখে মনে হয় তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। তাদের হাতে দড়ির এক মাথা, অন্য মাথায় একটা বোতল। ঘুরিয়ে ঠিকমত মারলে সেটা রীতিমত

একটা ভয়ংকর অস্ত্র। আমি বাথরুমে লাইটের সুইচটায় হাত দিয়ে বসে রইলাম। সুইচটা অন করতেই লাইট বাল্বের পিছনে রাখা পয়সাটা শর্ট সার্কিট করে মেইন সুইচে ফিউজ কেটে দেবে। ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যাবে তখন ঘরটা।

আমরা তিনজন চুপচাপ অপেক্ষা করছি। বুকের ভিতরে এক ধরনের ধুকপুকুনি। সব কিছু ভালয় ভালয় কাজ করবে তো? সত্যি আমরা পালাতে পারব তো? এরা ভয়ংকর মানুষ, যদি পালাতে না পারি আমাদের জানে মেরে ফেলবে। যেভাবেই হোক আমাদের পালাতে হবে। যেভাবেই হোক।

ঠিক এই সময় আমার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। নাওয়াজ খান আর ওসমান কথা বলতে বলতে এসে ছিটকিনি খুলে ঘরে এসে ঢুকে বাতি জ্বালালো। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছি, দুইজন মাকামাকি এসে দাঁড়িয়েছে। ওসমান জিজ্ঞেস করল, প্রথমে কোনটাকে?

নাওয়াজ খান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখন আমি বাথরুমের সুইচটা অন করে দিলাম, কোথায় জানি ভট্ করে একটা শব্দ হল আর সাথে সাথে সমস্ত ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। সলীল আর জয়নাল বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে উঠে, দড়িতে বাঁধা বোতলটা ঘুরিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে দুজনকে, ঠাস্ করে একটা শব্দ হল আর আমি প্রথমে নাওয়াজ খান তারপর ওসমানের চিৎকার শুনতে পেলাম। ধড়াস করে কেউ একজন পড়ে গেল, আমি সাথে সাথে প্রচণ্ড লাথি আর ঘুষির শব্দ শুনতে পেলাম। আমি বাথরুম থেকে বের হয়ে এসে হাত লাগালাম, অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, দুজন মনে হয় উবু হয়ে পড়ে আছে, প্রচণ্ড জোরে লাথি হাকালাম, কঁক করে শব্দ করে উঠল একজন। সলীল বলল, এখন বাইরে চল, কাজ শেষ—

জয়নাল লাথি মারতে মারতে বলল, আমি জানে মেরে ফেলব শুওরের বাচ্চাদের—

মাথা গরম কর না জয়নাল, সলীল জয়নালকে ধাক্কা দিয়ে বের করতে করতে বলল, আগে নিজের জান বাঁচাও।

আমরা ছুটে বাইরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ছিটকিনিটা টেনে দিলাম। হঠাৎ মনে হল, আর পায়ে জোর নেই, হাটু ভেঙে বসে পড়লাম তিনজন। বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে থাকি, মনে হয় বুক একেবারে ফাঁকা হয়ে আছে বাতাসের জন্যে। কি ভয়ংকর বিপদের হাত থেকেই না বেঁচে এসেছি!

ঘরের ভিতর থেকে নাওয়াজ খানের গলা শুনতে পেলাম। কেমন যেন ভাঙা গলায় বললেন, ওসমান! কি হল এটা ওসমান? কি হল?

ওসমান কোন কথা বলল না, কেমন যেন গোঙানোর মত শব্দ করল। ভিতর থেকে তারা দরজায় ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে, শক্ত ভারি দরজা, কিছু করতে পারবে মনে হয় না।

আমি ফিসফিস করে বললাম, চল পালাই।

জয়নাল বলল, যদি পালিয়ে যায়?

নাওয়াজ খান ভিতর থেকে বলল, এই যে ছেলেরা তোমরা দরজাটা খুলে দাও, প্লীজ! যদি খুলে দাও তাহলে—

তাহলে কি?

তোমাদের এত টাকা দেব যে তোমরা—

জয়নাল হিসহিস করে বলল, তোর টাকায় আমি পিশাব করে দিই।

আমি জয়নাল আর সলীলকে টেনে কোন মতে নিচে নামিয়ে আনি। পিছনে নাওয়াজ খান তখনো আমাদের ডাকাডাকি করে যাচ্ছে।

বাইরে তখনো বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ করে। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। পুলিশকে বলতে হবে কিন্তু ঠিক কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না। পুলিশ কি আমাদের কথা শুনবে? শুনলেও কি বিশ্বাস করবে?

ঠিক তখন দেখি ছাতা মাথায় লম্বা লম্বা পা ফেলে একজন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মানুষটি কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। হাতে একটা টর্চলাইট, সেটা আমাদের পায়ের কাছে জ্বালিয়ে বলল, কে? মুনীর? সলীল?

আমরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, জারুল স্যার! জারুল স্যার!

ভাল আছ তো তোমরা?

জি স্যার! ভাল আছি! চিঠি পেয়েছেন আমাদের?

হ্যাঁ, চিঠি পেয়েই তো আসছি! চিঠিতে লিখেছ—

ধরে ফেলেছি স্যার!

ধরে ফেলেছে? জারুল চৌধুরী অবাক হয়ে বললেন, কি ধরে ফেলেছ?

নাওয়াজ খান আর ওসমানকে। জয়নালকে বেঁধে রেখেছিল, ছুটিয়ে এনেছি! সলীলকেও ধরে ফেলেছিল—

কি বলছ তোমরা?

খোদার কসম! আমি হড়বড় করে কথা বলতে থাকি, সলীল আমাকে থামিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করে, জয়নাল তার মাঝে হুংকার দিয়ে বলে, জবাই করে ফেলব বদমাইশের বাচ্চাদের। জবাই করে ফেলব।

জারুল চৌধুরী কি হয়েছে বোঝার চেষ্টা করতে থাকেন। আমাদের চেঁচামেচিতে দেখতে দেখতে আমাদের ঘিরে একটা ভিড় জমে উঠে। অন্য সময় হলে কেউ আমাদের কথা শুনত কিনা জানি না, কিন্তু এখন সবাই শুনছে। জারুল চৌধুরী খুব মন দিয়ে শুনছেন, সে জন্যেই হয়তো।

বুকটা হঠাৎ হালকা হয়ে যায়, আর আমাদের কোন ভয় নেই। জানে বেঁচে গেছি আমরা।

আহ্! বেঁচে থাকা কি আনন্দের ব্যাপার!

১৪. পুলিশ

দৃশ্যটা খুব অদ্ভুত। নাওয়াজ খানের হাতে হাতকড়া লাগানো। হাতকড়া লাগানোর সময় হাতগুলি পিছনে কেন রাখা হয় কে জানে? তাকে একটা চেয়ারে বসানো হয়েছে, হাজার হলেও একজন সম্মানী ডাক্তার মানুষ।

ওসমানের হাতেও হাতকড়া, কিন্তু তার জন্যে কোন চেয়ার নেই, সে বসেছে মেঝেতে। দুজনের মুখ খুব গম্ভীর, দেখে মনে হয় গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু ভাবছে। নাওয়াজ খানের কপালটা ফুলে আছে, জয়নালের বোতল দিয়ে লেগেছে। ওসমানের বাম চোখটাও প্রায় বুঁজে এসেছে। অন্ধকারের সেই মারামারিতে কে কোথায় মার খেয়েছে বোঝা মুশকিল।

বড় একটা টেবিলের এক পাশে বসেছেন একজন পুলিশ অফিসার। মাঝবয়সী মানুষ, মুখে মোটা মোটা গোঁফ। দেখে কেমন যেন ভয় ভয় করে। টেবিলের অন্য পাশে বসেছেন জারুল চৌধুরী। তাঁর মুখটাও খুব গম্ভীর। কারণটা কি কে জানে! জারুল চৌধুরীর অন্যপাশে তিনটা চেয়ারে বসেছেন আমার বাবা, সলীলের বাবা আর উকিল সাহেব। পুলিশ অফিসার গভীর রাতে কনেস্টবল পাঠিয়ে এই তিনজনকে ডেকে পাঠিয়েছেন। টেবিলের সামনে একটা বেঞ্চে আমি, সলীল আর জয়নাল চাপাচাপি করে বসেছি। আমাদের চারপাশে অনেক কয়জন পুলিশ, সবাই হাঁটাহাঁটি করছে, ব্যস্ততা নেই, কিন্তু হাঁটাহাঁটির মাঝে খুব একটা গুরুত্বের ভাব।

পুলিশ অফিসারটি টেবিলে একটা পেন্সিল ঠুকতে ঠুকতে বললেন, আমি অনেকদিন থেকে পুলিশে চাকরি করি কিন্তু এরকম কেস একটাও দেখিনি।

জারুল চৌধুরী বললেন, শুনে ভরসা পেলাম। এরকম কেস যে একটাও আছে সেটাই কি বেশি নয়?

তা ঠিক প্রফেসর সাহেব। পুলিশ অফিসার মাথা নাড়লেন, যদি এই ছেলেরা না ধরত, কোনদিন কি আমরা ধরতে পারতাম? পারতাম না। কোনদিনই পারতাম না।

জারুল চৌধুরী বললেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মোটামুটি হাবাগোবা ছিলাম। আর এদের দেখেন, কি বুদ্ধি! এই বয়সে এরকম বুদ্ধি চিন্তা করতে পারেন? বড় হলে কি হবে?

পুলিশ অফিসারটি হা হা করে হেসে ওঠলেন আর হঠাৎ তাঁকে বেশ ভাল মানুষের মত মনে হতে লাগল। এতক্ষণ তাকে দেখে যে একটু ভয় ভয় লাগছিল সেই ভয়টা কেটে গেল হঠাৎ। পুলিশ অফিসার হাসতে হাসতেই বললেন, কোথা থেকে যে এদের মাথায় এরকম বুদ্ধি বের হল! এরকম বিপদের মাঝেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কি কি করেছে দেখেছেন? বাল্বের নিচে পয়সা দিয়ে ফিউজ কেটে দেওয়া, হাতের বাঁধন খুলেও ভান করা যে হাত বাঁধা, দড়ির মাঝে বোতল বেঁধে অস্ত্র তৈরি করা!

আমি আর সলীল কিছু না বলে নড়েচড়ে বসলাম। খুব কমই হয়েছে যে, কেউ

আমাদের প্রশংসা করেছে, প্রশংসা করলে কি বলতে হয় ছাই জানিও না। হাসি হাসি মুখ করে বসে থাকাই মনে হয় সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

এরকম সময় একজন মানুষ এসে পুলিশ অফিসারের সাথে নিচু গলায় বেশ অনেকক্ষণ কথা বলল। কি নিয়ে কথা হচ্ছিল ঠিক বুঝতে পারলাম না। পুলিশ অফিসারটি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন। তারপর কি একটা বললেন, তখন আরও কয়েকজন পুলিশ এসে নাওয়াজ খান ও ওসমানকে সরিয়ে নিয়ে গেল। পুলিশ অফিসার একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কি সাংঘাতিক ব্যাপার! মানুষ যেরকম করে সুপারির কিংবা গুড়ের ব্যবসা করে এরা সেভাবে ছোট ছোট গরিব বাচ্চাদের কিডনি, লিভার এসবের ব্যবসা করত! চিন্তা করতে পারেন?

উপস্থিত যারা ছিল সবাই আবার অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। ঠিক এসময় একজন মানুষ বেশ অনেক কাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে এল। এখন গভীর রাত, বেশি রাত হলে আমি কিছু খেতে পারি না, কিন্তু আজকে বিস্কুটগুলি দেখে হঠাৎ আমার খিদে চাগিয়ে উঠল। পুলিশ অফিসার বিস্কুটগুলি আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে চায়ে চুমুক দিলেন। তারপর সলীলের বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, সলীল আপনার ছেলে?

সলীলের বাবা মাথা নাড়লেন। পুলিশ অফিসার তখন বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, আর মুনীর আপনার?

বাবা মাথা নাড়লেন।

কেমন করে এরকম বুদ্ধিমান ছেলে হয় আপনাদের? এইটুকু ছেলে, কি বুদ্ধি! কি রকম বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে! শুধু কি বুদ্ধি? আরেকজনকে বাঁচানোর জন্যে কত বড় ঝুঁকি নিয়েছিল চিন্তা করতে পারেন? কি রকম চমৎকার ব্যাপার। তাই না রে জয়নাল?

জয়নাল জোরে জোরে মাথা নাড়ল।

পুলিশ অফিসার মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আমাকে বলতেই হবে আপনাদের হীরার টুকরা ছেলে। একটু ডানপিটে হয়তো কিন্তু একেবারে সোনার খনি—

সলীলের বাবা একটু নড়েচড়ে বললেন, আপনার কথা শুনে ভাল লাগল স্যার। বড় ভাল লাগল। টানাটানির সংসার, ছেলেমেয়েদের যত্ন করতে পারি না। এই ছেলেটা তো বলতে গেলে নিজে নিজেই বড় হচ্ছে। আশীর্বাদ করেন যেন মানুষ হয়।

অবিশ্যি অবিশ্যি আশীর্বাদ করব। একশবার আশীর্বাদ করব।

পুলিশ অফিসার তখন বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার কেমন লাগে যখন দেখেন আপনার ছেলে এরকম সাংঘাতিক একটা কাজ করেছে?

বাবা কিছু বললেন না, নড়েচড়ে বসলেন।

পুলিশ অফিসার হেসে বললেন, আপনার হয়তো বেশি আশ্চর্য মনে হয় না। সব সময়েই দেখে এসেছেন হীরার টুকরা ছেলে! আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তবুও গর্বে বুক ফুলে যায়। যায় না?

বাবার মুখ কেমন জানি ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সেই অবস্থায় খুব কষ্ট করে খুব দুর্বলভাবে একবার মাথা নাড়লেন।

পুলিশ অফিসার তখন আমাদের দিকে তাকালেন, তারপর চোখ নাচিয়ে বললেন, আমার ডিপার্টমেন্টে আসলে তোমাদের মত কয়জন মানুষ দরকার! খাঁটি ডিটেকটিভ—

জারুল চৌধুরী হাত নেড়ে বললেন, সর্বনাশ! কি করছেন আপনি! ডানপিটে ছেলে এরা, সত্যি সত্যি চোর-ডাকাত-খুনেদের সাথে হাতাহাতি শুরু করে দেবে! ভাল চান তো ওদের আচ্ছামত বকে দিন। আর যেন এরকম না করে।

পুলিশ অফিসার আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, প্রফেসার সাহেব ঠিকই বলেছেন। তোমাদের বেশি উৎসাহ দেখিয়ে কাজ নেই—

হঠাৎ কি মনে হল জানি না, আমি বলে ফেললাম, আমি আসলে আরো একটা কাজ করছি।

সবাই আমার দিকে ঘুরে তাকাল। পুলিশ অফিসার ঘুরে তাকিয়ে বললেন, কি কাজ?

এখানে ভেজাল ওষুধের ব্যবসা হয় সেটা বের করার চেষ্টা করছি।

আমি আড়চোখে বাবার দিকে তাকালাম, তাঁর চোয়াল হঠাৎ ঝুলে পড়ল, মুখ মাছের মত নড়তে লাগল। পুলিশ অফিসারটি একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, ভেজাল ওষুধ?

জী।

কে ভেজাল ওষুধের ব্যবসা করে?

আমি একটু ইতঃস্তত করে বললাম, সেটা বলার এখনো সময় হয়নি।

পুলিশ অফিসার হাসিমুখে বললেন, ইনভেস্টিগেশান বাকি আছে এখনো?

আমি মাথা নাড়লাম।

বেশ! যখন ইনভেস্টিগেশান শেষ হবে, আমাকে বল।

আমি মাথা নাড়লাম, বলব।

জারুল চৌধুরী আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, চোখে চোখ পড়তেই তিনি একবার চোখ মটকালেন, যার অর্থ বাইরের কেউ বুঝতে পারল না। সলীল কনুই দিয়ে আমার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে গলা নামিয়ে বলল, তুই একটা ডেঞ্জারাস মানুষ!

আমি বাবার দিকে তাকালাম। তাঁর সমস্ত মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে আছে। এর আগে আমি তাঁকে কখনো ভয় পেতে দেখিনি। আগে লক্ষ্য করেছিলাম, রাগ হলে বাবার চেহারা খুব খারাপ হয়ে যায়। এখন দেখছি ভয় পেলেও তাঁর চেহারা খুব খারাপ হয়ে যায়।

১৫. শেষ কথা

বাবা আমাকে আর লাবলুকে আর কখনো মারেননি। তার মানে এই নয় যে, বাবা একেবারে মহৎপ্রাণ মানুষ হয়ে গেছেন, হঠাৎ করে আমাদের জন্যে ভালবাসায় তাঁর বুক উথলে উথলে উঠেছে। সেরকম কিছু হয়নি, বাবা আগের মতই আছেন। খারাপ মানুষেরা, নিষ্ঠুর হৃদয়হীন মানুষেরা হঠাৎ করে খুব ভাল হয়ে গেছে এগুলি শুধু গল্প আর উপন্যাসে পাওয়া যায়। সত্যিকারের জীবনে মনে হয় সেটা হয় না। যে খারাপ সে খারাপই থাকে, শুধু তার সাথে কোনভাবে বেঁচে থাকা শিখতে হয়। আমরা সেটা শিখছি। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এখনো আমাদের মারার জন্যে বাবার হাত নিশপিশ করে কিন্তু আর সাহস করতে পারেন না। যদি তাঁর ভেজাল ওষুধের কথা বলে দেই!

এমনিতেই আমাদের ছোট শহরটাতে আমার আর সলীলের বেশ নামধাম হয়েছে। খবরের কাগজে আমাদের ছবিও ছাপা হয়েছিল। আমি আর সলীল দাঁড়িয়ে আছি মাঝখানে একটা টুলে, জয়নাল বসে আছে। ছবি তোলার সময় ফটোগ্রাফার বলেছিল হাসি হাসি মুখ করে তাকাতে, জয়নাল একেবারে সবগুলি দাঁত বের করে হেসে ফেলল। খবরের কাগজের সেই অংশটা আমি কেটে রেখেছি, বাসায় কেউ এলে সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাদের দেখাই।

নাওয়াজ খান আর ওসমানের বিচার শুরু হয়েছে। দুজনেই নাকি ঘাঘু মানুষ। আগের অনেক ইতিহাস আছে, জামিন পায়নি বলে জেলেই আছে। সবাই বলছে ফাঁসি হয়ে যাবে দুজনেরই।

জারুল চৌধুরীর সাথে এখনো যোগাযোগ আছে। আমাদের হেডস্যারকে নিয়ে ফিল্ড ট্রিপে একবার তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। নদী, জংগল, গাছপালা, গাছের উপর গাছঘর, দেখে সবাই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। জারুল চৌধুরী একটা নৌকা কিনেছেন, পিছনে ইঞ্জিন লাগিয়ে নাকি নৌকা ভ্রমণে বের হবেন। সাথে থাকবে দুই সিন্ধু কাগজ। সেই কাগজে তিনি তাঁর বইটা লিখবেন — "শিশুদের ক্যালকুলাস"।

নাওয়াজ খানের পুরো ব্যাপারটা যেভাবে শেষ হয়েছে সেটাতে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে লাবলু। বাবার মার খেতে হয় না বলে আজকাল সে অনেক হাসিখুশি থাকে। প্রতি রাতেই ঘুমানোর আগে বলে,স ভাইয়া, তোমরা কেমন করে নাওয়াজ খানকে ধরেছ গল্পটা বলবে?

আমি বলি, ধুর, গাধা! এক গল্প মানুষ কয়বার শুনে?

লাবলু বলে, বল না আরেকবার — মাত্র একবার।

আমি তখন তাকে গল্পটা আবার বলি। প্রত্যেকবারই গল্পটার সাথে আরো অনেক অনেক মালমশলা যোগ করি। অনেকখানি অতিরঞ্জন, নানারকম হাস্য-কৌতুক, ঠাট্টা-তামাশা।

শুনে লাবলু একেবারে হেসে কুটিকুটি হয়।

কতদিন এভাবে চলবে জানি না। কিন্তু যতদিন চলছে ততদিন তো উপভোগ করে নিই! এই ছোট শহরে তো আর দৈনন্দিন এরকম বড় ঘটনা ঘটে না!

—— ০ ——